প্রাথমিক বিজ্ঞান
শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত
(১৫।১২।১৯৫৪ তারিখের ৬ টি. বি. নং নোটিফিকেশন দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক
শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়
এম. এস-সি. (কলিকাতা), ডি. এস-সি. (লণ্ডন),
ডি. আই. সি. (লণ্ডন), এফ. এন. আই.
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার অধ্যাপক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এস-সি. (কলিকাতা), পি-এচ. ডি. (এডিনবারা), এফ. এল. এস. (লণ্ডন)
প্রণীত

বাণীমন্দির
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

সূচনা

আমরা পৃথিবীতে দুই প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই,—**জীব** ও **জড়**। যাহাদের প্রাণ বা জীবন আছে তাহারাই জীব এবং যাহাদের প্রাণ নাই তাহারা জড় পদার্থ। প্রাণ বা জীবন কি তাহার সঠিক ধারণা বা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কিন্তু জীবমাত্রেরই এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহার জন্য সজীব পদার্থকে সহজেই জড় পদার্থ হইতে পৃথক করা যায়। গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিতে এই লক্ষণগুলি পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের জীব বলে। মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতিতে ঐ সকল লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না বলিয়াই উহারা জড় পদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ জীবনের যে সকল লক্ষণ স্থির করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ,—(১) শরীর-পোষণ, (২) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, (৩) দেহের বৃদ্ধি, (৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া করিবার ক্ষমতা, (৫) দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় জিনিস দূর করিতে পারা, (৬) উদ্দীপনা-শক্তি অর্থাৎ বাহিরের আঘাতে বা উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, (৭) জন্ম, (৮) বংশ-বৃদ্ধি এবং (৯) মৃত্যু। জীব বা জড় পদার্থ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও পদার্থ নাই। জীব-জগৎকে আমরা দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করি,—**উদ্ভিদ্** ও **প্রাণী**। যে বিজ্ঞান পাঠ করিলে জীব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় তাহাকে **জীব-বিজ্ঞান** বলে। ইহার দুইটি শাখা,—**উদ্ভিদ্-বিদ্যা** ও **প্রাণিবিদ্যা**। 'উদ্ভিদ্-বিদ্যা' হইতে গাছপালার ও 'প্রাণিবিদ্যা' হইতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

এই বিশাল জীব-জগতের রূপ অনন্ত। জীবগণ যে কেবল জলে বা স্থলে বাস করে তাহাই নহে। দৃশ্যমান জীব-জগতের বাহিরেও স্থলে, জলে, বাতাসে এমন কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে যাহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না। তাহাদিগকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। এই জীব-জগতের বিশালতার কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

প্রথম অধ্যায়

বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের কার্য্য

বৃক্ষ বলিতে আম, জাম, কাঁঠাল, বট, দেবদারু প্রভৃতি বড় বড় উদ্ভিদ্‌কে বুঝায় (১নং চিত্র)। ইহারা **স্থলে বাস** করে এবং **বহুকাল বাঁচিয়া** থাকে। এই সকল গাছের কাণ্ড মাটি হইতে কিছু উপর পর্য্যন্ত মোটা ও সরল এবং ঐ অংশে কোনও শাখা-প্রশাখা থাকে না। এই অংশটিকে **গুঁড়ি** বলে। নারিকেল (১১নং চিত্র, ক), সুপারি, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ডে কোনও শাখা থাকে না; সব কাণ্ডটি একটি বড় গুড়ি। ইহা ছাড়া বৃক্ষের কাণ্ড **শক্ত ও কাষ্ঠময়** বলিয়া উহা সোজা ভাবে মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকে। গুঁড়ি উপরের দিকে যেখানে শেষ হয় সেখান হইতে কাণ্ডের **শাখা-প্রশাখা** বাহির হয়। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় ছোট বড় অসংখ্য সবুজ রংয়ের **পাতা** সাজান থাকে। বৃক্ষের যে অংশটি মাটির নীচে থাকে
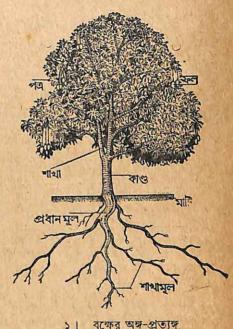
১। বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তাহাকে **মূল** বলে। মূলের একটি প্রধান অংশ গুঁড়ির গোড়া হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া মাটির মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে অনেকদূর পর্য্যন্ত যায়, ইহাকে **প্রধান মূল** বলে। ইহা হইতে অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া মাটির মধ্যে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড ও উহার শাখা-প্রশাখা, এবং পাতা, এই তিনটি প্রধান অংশ। চারাগাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ-পরিণত বৃক্ষের দেহে এই তিনটি অঙ্গ ছাড়া আর কোনও অঙ্গ দেখা যায় না। ইহাদের সাহায্যে বৃক্ষের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিণত বয়সে বৃক্ষে ফুল ফোটে, পরে ঐ ফুল হইতে ফল হয় এবং উহার মধ্যে বীজ থাকে। ফল পাকিলে বীজ মাটিতে পড়ে ও অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুর বাহির হয়। ক্রমে উহা হইতে নূতন চারাগাছ জন্মে। সেই চারাগাছ ক্রমশঃ বড় হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। ফুল, ফল এবং বীজকেও বৃক্ষের অঙ্গ বলা হয়। ইহাদিগকে সকল সময়ে বৃক্ষে দেখা যায় না। বংশের বৃদ্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হইলে ইহারা দেখা দেয়।
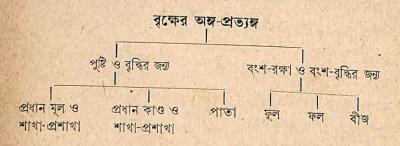
মূলের কার্য্য—মূল প্রধানতঃ তিন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। উহা বৃক্ষকে মাটির উপর সোজা ও দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে এবং সেইজন্য ঝড়-বাতাসে বৃক্ষ উপড়াইয়া যায় না। মূল মাটি হইতে ধাতব লবণ জলে গলিত অবস্থায় শুষিয়া লয় এবং খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য

ঐ রস কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় পাঠাইয়া দেয়। খাদ্য অতিরিক্ত হইলে বৃক্ষ প্রয়োজনমত উহার মূলে খাদ্য জমা করিয়া রাখে।

প্রধান মূল বা উহার শাখা-প্রশাখাকে শক্ত মাটির ভিতর দিয়া বাড়িতে হয়। ইহাদের আগা অতিশয় নরম। মাটির ভিতর দিয়া আগাইবার সময় যাহাতে এই অংশটি নষ্ট না হয় সেজন্য প্রত্যেক মূলের মাথায় একটি করিয়া টুপির মত ঢাক্না থাকে যাহাকে **মূলত্র** বলে। ইহা ছাড়া আগার কিছু পিছনে মূলের কতক অংশ জুড়িয়া অসংখ্য রোম থাকে। এইগুলিকে **মূলরোম** বলা হয়। বৃক্ষ এই সকল মূলরোমের সাহায্যেই মাটি হইতে রস শুষিয়া লয়। মূল ও কাণ্ডের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ নলাকার পথ আছে। উহার ভিতর দিয়াই মাটির রস পাতায় পৌঁছায় এবং পাতায় খাদ্য তৈয়ারী হইবার পর অন্য প্রকার নলিকাগুচ্ছের ভিতর দিয়া ঐ খাদ্য বৃক্ষের দেহের নানাস্থানে চলাচল করে।

কাণ্ডের কার্য্য—কাণ্ড ও উহার শাখা-প্রশাখা সবুজ পাতাকে সূর্য্যকিরণে ধরিয়া রাখে এবং সময়মত ফুল ও ফল ধারণ করে। উহাদের ভিতর দিয়া মাটির রস মূল হইতে পাতায় যায় এবং সেখানে খাদ্য প্রস্তুত হইবার পর ঐ খাদ্য কাণ্ডের ভিতর দিয়া দেহের নানা অংশে চলাচল করে। খাদ্য অতিরিক্ত হইলে উহা কাণ্ডের ভিতরের বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে।

পাতার কার্য্য—পাতার একটি প্রধান কার্য্য হইল খাদ্য প্রস্তুত করা। মূল মাটি হইতে জলে গলিত অবস্থায় খাদ্যের উপকরণ যোগাড় করে ; উহা ক্রমে কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় পৌঁছায়। পাতার ত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। বাতাস হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই সকল ছিদ্র দিয়া পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল

উপকরণ হইতে পাতা উহার সবুজ রং (ক্লোরোফিল) ও সূর্য্যকিরণের সাহায্যে চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি খাদ্য তৈয়ারী করে। দিনের বেলা ছাড়া পাতা খাদ্য তৈয়ার করিতে পারে না, কারণ দিনেই সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বৃক্ষ প্রধানতঃ পাতার সাহায্যেই শ্বাস-কার্য্য চালাইয়া থাকে। পাতার ছিদ্র দিয়া বায়ুর সহিত অক্সিজেন গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষদেহের সর্ব্বত্র চলাচল করে। এই অক্সিজেন গ্যাসের সহিত সঞ্চিত খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দহনকার্য্য চলে এবং শরীরের মধ্যে তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হয়। এই দহনকার্য্য চলিবার সময় কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং উহারা পাতার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। খাদ্য-প্রস্তুত শুধু দিনের আলোকেই হইয়া থাকে কিন্তু শ্বাস-কার্য্য দিনরাত সকল সময়ে চলিয়া থাকে। পাতার প্রধান কাজগুলির মধ্যে দেহের ভিতরকার অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেওয়াও একটি কাজ। ইহাকে প্রস্বেদন বলে।

ফুলের কার্য্য—ফুলের প্রধান কার্য্য হইল বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধি করা। ফুল না ফুটিলে ফল হইবে না এবং ফল না হইলে বীজ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্যই ফুল সুগন্ধ-যুক্ত হয়। বর্ণ ও গন্ধের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মধুর লোভে কীট-পতঙ্গ ফুলে বসিলে পরাগ-মিলন ঘটে এবং ক্রমশঃ ফল ও বীজের জন্ম হইয়া থাকে। পরাগ-মিলনের কাজ শেষ হইলে ফুলের পাপড়িগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া যায় এবং ফুল হইতে ফলটি ক্রমশঃ বাহির হইয়া পড়ে।

ফুলের কার্য্য—ফল প্রথমাবস্থায় বীজকে রক্ষা করে। ফলটি পাকিলে নানা উপায়ে বীজের বিস্তার ঘটে। বীজের মধ্যে বৃক্ষশিশু

আর কিছু জমা খাদ্য থাকে। অনুকূল অবস্থায় ঐ বীজ হইতে নূতন চারাগাছ জন্মে।

খাদ্য-প্রস্তুতি ও শ্বাস-কার্য্যের তুলনা

খাদ্য-প্রস্তুতি	শ্বাসকার্য্য
১। বায়ুর কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্ব্বন এবং মাটি হইতে জল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পাতার সবুজ রং ও সূর্য্যকিরণের সাহায্যে উদ্ভিদ্ নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে।	১। উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে অক্সিজেন লয় ও নিজের দেহ হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প বাহির করিয়া দেয়।
২। কেবল দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোকেই ইহা সম্ভব হয়।	২। ইহা দিবারাত্র সকল সময়েই চলে।
৩। দেহের শুধু সবুজ অংশেই ইহা হইতে পারে।	৩। দেহের সকল অংশেই ইহা চলিয়া থাকে।
৪। খাদ্যের মধ্যে সূর্য্যের শক্তি জমা হয়।	৪। অক্সিজেনের সহিত খাদ্যের দহনকার্য্যের ফলে শরীরের মধ্যে তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হয়।
৫। উদ্ভিদ্ ওজনে বাড়ে।	৫। উদ্ভিদের ওজন কমে।

প্রশ্ন

১। কি কি লক্ষণ দেখিয়া জীবকে জড় পদার্থ হইতে পৃথক করা যায়?
২। বৃক্ষ কাহাকে বলে? বৃক্ষের দেহে কি কি অঙ্গ থাকে?
৩। বৃক্ষ কোন্ অঙ্গের দ্বারা মাটি হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে?
৪। মূলরোম ও মূলত্র কাহাকে কহে?
৫। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬। খাদ্য-প্রস্তুতি ও শ্বাসকার্য্যের তুলনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং কয়েকটি সাধারণ ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা

একটি সাধারণ ফুলের বিভিন্ন অংশ

সাধারণতঃ ফুলের চারিটি স্তবক থাকে, যথা,—(১) **বৃতি**, (২) **দল**, (৩) **পুংকেশর চক্র** ও (৪) **গর্ভকেশর চক্র**। একটি ধুতুরা ফুল (২নং চিত্র) লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহার সকলের নীচে ও বাহিরের দিকে একটি সবুজ রংয়ের ঢাকা আছে। এই ঢাকাটির নাম বৃতি। উহার উপরিভাগ দাঁতের মত সামান্য কাটা থাকে ; ঐ এক একটি দাঁতের মত অংশকে **বৃত্যংশ** বলে। বৃত্যংশ সংখ্যায় পাঁচটি এবং উহারা নীচের দিকে জুড়িয়া গিয়া ঢাকাটিকে তৈয়ার করিয়াছে (২নং চিত্র, ক)। কুঁড়ি অবস্থায় বৃতি ফুলের ভিতরকার অন্যান্য অংশগুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং রৌদ্র, বাতাস, শিশির প্রভৃতি হইতে উহাদের রক্ষা করে। বৃতির ভিতর হইতে ফুলের অন্যান্য অংশগুলি বাহির হইলে ফুল ফোটে। বৃতির ঠিক ভিতরে ও সামান্য উপরে পাঁচটি সাদা বা বেগুনি রংয়ের **পাপড়ি** একত্র মিলিত হইয়া একটি বড় কল্‌কের আকার ধারণ করিয়াছে (২নং চিত্র, ক)। ইহাই ফুলের দ্বিতীয় স্তবক ; ইহাকে **দল** বলে। পাপড়ি বা দল ফুলের সৌন্দর্য্য বাড়ায় এবং অনেক সময়ে ইহাদের গন্ধও সুমিষ্ট হয়। ফুলের রূপে, রংয়ে ও গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কীট পতঙ্গ ফুলে আসিয়া বসে এবং পরোক্ষভাবে বংশরক্ষায় সাহায্য করে। দলের ভিতরে

পর পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক দুইটিকে দেখা যায়; তাহাদের নাম যথাক্রমে **পুংকেশর চক্র** ও **গর্ভকেশর চক্র**। দলটি লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া ফেলিলে উহার গায়ে পাঁচটি **পুংকেশর** দেখা যায় (২নং চিত্র, খ)। পুংকেশরগুলি সরু ও লম্বা এবং প্রত্যেকটি নীচের
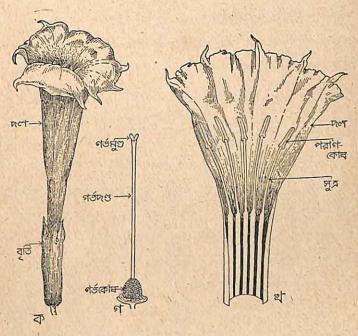
২। ধুতুরা ফুল ও উহার বিভিন্ন অংশ

দিকে দলের সহিত জোড়া থাকে। পুংকেশরের লম্বা ও সরু অংশটির নাম সূত্র এবং উহার মাথায় একটি লম্বা ও চেপ্টা **পরাগকোষ** আছে। এই পরাগকোষের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলুদ রংয়ের **পরাগ** বা রেণু থাকে। ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে গর্ভকেশর চক্র অবস্থিত

(২নং চিত্র, গ)। উহার গোড়ার দিক দেখিতে মোটা ও ফাঁপা ; এই অংশটিকে **গর্ভকোষ** বলে। গর্ভকোষের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বা **ডিম্বকোষ** আছে ; ইহারাই ভাবী বীজ। গর্ভকোষের উপরের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি **গর্ভদণ্ডের** সৃষ্টি করিয়াছে। গর্ভদণ্ডটির আগা কিছু চেপ্টা ও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার নাম **গর্ভমুণ্ড**। গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা হইতে অনেক সময়ে গর্ভকেশরের সংখ্যা ঠিক করা হয়। ধুতরা ফুলে দুইটি গর্ভকেশর আছে ; উহারা পরস্পর জুড়িয়া গিয়া গর্ভকেশর চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ধুতরা ফুলের এই চারিটি স্তবক ফুলের বোঁটার উপরিভাগে একটির উপর অপরটি, এভাবে সাজান থাকে। বোঁটার এই অংশটিকে **পুষ্পাধার** বলে।

পুংকেশর ও গর্ভকেশর হইল ফুলের প্রধান অঙ্গ। উহাদের উভয়ের মিলনে ফল ও তাহার ভিতর বীজ জন্মায়। বৃতি ও দল জল, বাতাস, রৌদ্র, শিশির, পোকা প্রভৃতি হইতে পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে রক্ষা করে। পাপড়ি অনেক সময়ে গন্ধ, মধু বা নানা রংয়ের প্রলোভন দেখাইয়া কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে ফুলে আকর্ষণ করে এবং উহারা ফুলে বসিয়া পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মিলন ঘটায়। মিলনের পর সাধারণতঃ বৃতি ও দল ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়ে।

ধুতরা ফুলের মত যে সব ফুলে চারিটি স্তবক থাকে তাহাদিগকে **সম্পূর্ণ ফুল** এবং ইহাদের কোনও একটির অভাব হইলে **অসম্পূর্ণ ফুল** বলা হয়। গোলাপ, জবা, পদ্ম, বক, শিউলি, আম প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুল এবং লাউ, কুমড়া, কচু, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ফুলের উদাহরণ। যে সব ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দুইই থাকে তাহাদিগকে **উভলিঙ্গ ফুল** বলে। শসা, কুমড়া, লাউ, তাল, খেজুর, পেঁপে প্রভৃতির ফুল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে কোনও ফুলে হয় পুংকেশর না হয়

গর্ভকেশর আছে। এই প্রকার অসম্পূর্ণ ফুলকে **একলিঙ্গ** এবং **পুরুষফুল** কিংবা **স্ত্রীফুল** বলে। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতির একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার ফুলই ফোটে কিন্তু পেঁপে, তাল প্রভৃতির কোনও গাছে পুরুষ-ফুল এবং কোনও গাছে স্ত্রী-ফুল ফুটিয়া থাকে।

কয়েকটি সাধারণ ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা

জবা ফুল—জবা সম্পূর্ণ ও উভলিঙ্গ **ফুল** (৩নং চিত্র)। ইহার বোঁটা আছে, সেইজন্য ইহাকে সবৃন্তক ফুলও বলে। ইহার বৃতি পাঁচটি বৃত্যংশ লইয়া গঠিত এবং উহারা পরস্পর জোড়া (৩নং চিত্র, ক, খ)। বৃতির নীচে কয়েকটি সরু সরু সবুজ অংশ থাকে যাহাকে উপবৃত্তি বলে (৩নং চিত্র, ক, খ)। বৃতির মধ্যে দল থাকে ; উহাতে সাধারণতঃ লাল রংয়ের পাঁচটি পাপড়ি আছে। জবাফুলের পাপড়িগুলি পৃথক, পরস্পর জোড়া নয়। উহার পুংকেশর চক্রে অনেক পুংকেশর আছে এবং পুংকেশরের সূত্রগুলি পরস্পর জুড়িয়া গিয়া একটি লম্বা নলের আকার ধারণ করিয়াছে (৩নং চিত্র, ক, ঘ, ঙ)। এই নলের নীচের অংশটি পাপড়িগুলির নীচের অংশের সঙ্গে জুড়িয়া থাকে। নলটি সাবধানে লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিলে ফুলের গর্ভকেশর চক্র বাহির হইয়া পড়ে (৩নং চিত্র, ঙ)। গর্ভকেশরের তিনটি অংশ দেখা যায়,—(১) **গর্ভকোষ,** মোটা ও ফাঁপা, (২) **সূত্র,** সরু, লম্বা, সাদা রংয়ের এবং উহা পুংকেশরের নলের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আগার দিকে পাঁচটি শাখায় ভাগ হইয়াছে, এবং (৩) **গর্ভমুণ্ড,** গোলাকার ও চেপ্টা, আঠার মত চট্‌চটে, সংখ্যায় পাঁচটি ও শাখার আগায় একটি করিয়া অবস্থিত। গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা হইতে বোঝা যায় যে গর্ভকেশরের সংখ্যা পাঁচটি এবং

দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত (৪নং চিত্র, ক, খ)। পাপড়িগুলি নীল বা সাদা রংয়ের হইয়া থাকে এবং উহারা সংখ্যায় পাঁচটি ও পরস্পর আলাদা। একটি পাপড়ি অন্যগুলি হইতে অনেক বড় এবং কুঁড়ি অবস্থায় অপর চারিটি পাপড়িকে ঢাকিয়া রাখে। ফুল ফুটিলে ঐ পাপড়িটি বাহিরের দিকে উঁচু হইয়া থাকে। উহার মধ্যে দুই পাশে দুইটি পাপড়ি এবং উহাদের ভিতরে ও পাশে আরও দুটি পাপড়ি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভিতরের পাপড়ি দুইটি নীচের দিকে একত্র জুড়িয়া গিয়া নৌকার খোলের মত আকার লইয়াছে। ইহার পুংকেশর চক্রে দশটি পুংকেশর আছে (৪নং চিত্র, গ)। উহাদের মধ্যে নয়টি সূত্র একত্র জুড়িয়া গিয়া গর্ভকেশরটির কতক অংশ ঢাকিয়া রাখে ; অপর পুংকেশরটি আলাদা। গর্ভকেশর-চক্রে একটিমাত্র গর্ভকেশর (৪নং চিত্র, ঘ) আছে। গর্ভকোষটি

৪। অপরাজিতা ফুল ও উহার বিভিন্ন অংশ

লম্বা ও চেপ্টা এবং উহার সূত্রটি ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি গর্ভমুণ্ডে শেষ হইয়াছে। গর্ভমুণ্ডে হাত দিলে আঠার মত চট্‌চটে মনে হয়। গর্ভকোষের একধারে কয়েকটি ডিম্বকোষ সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে।

উহারা পরস্পর জুড়িয়া গিয়া গর্ভকেশর চক্র তৈয়ার করিয়াছে। গর্ভকোষে অসংখ্য ডিম্বকোষ দেখা যায়।

৩। জবা ফুল ও উহার বিভিন্ন অংশ ; ঘ ও ঙ, পুংকেশরের দণ্ডটিকে লম্বালম্বি ভাবে চিরিয়া গর্ভকেশর চক্রকে দেখান হইয়াছে

অপরাজিতা ফুল—ইহা সম্পূর্ণ, উভলিঙ্গ ও সবৃন্তক ফুল (৪নং চিত্র)। ফুলের বোঁটাটি জবার মত লম্বা নয়, আকারে অনেক ছোট। ইহার বৃতি পাঁচটি সবুজ রংয়ের বৃত্যংশ লইয়া গঠিত এবং বৃত্যংশগুলি পরস্পর জোড়া থাকে (৪নং চিত্র, ক)। বৃতির মধ্যে দলটি

কুমড়া ফুল—কুমড়া ফুল সবৃন্তক, অসম্পূর্ণ ও একলিঙ্গ (৫নং চিত্র)। পুরুষ ও স্ত্রী-ফুল একই গাছে ফুটিয়া থাকে। ফুলের বোঁটা দেখিতে লম্বা ও উহার গায়ে অসংখ্য রোম আছে। বৃতি পাঁচটি সবুজ রংয়ের বৃত্যংশ লইয়া গঠিত এবং নীচের দিকে উহারা পরস্পর
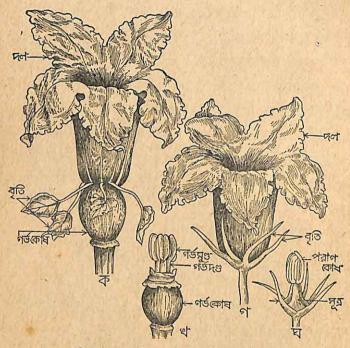
৫। কুমড়ার স্ত্রী-ফুল (ক) ও পুরুষ-ফুল (গ) এবং উহাদের বিভিন্ন অংশ

জোড়া। বৃতির উপরিভাগ আলাদা ; পুরুষ-ফুলে বৃত্যংশগুলি দেখিতে সরু (৫নং চিত্র, গ), কিন্তু স্ত্রী-ফুলে অধিকাংশ সময়ে উহারা দেখিতে সবুজ পাতার মত (৫নং চিত্র, ক)। ফুলে পাঁচটি হলুদ রংয়ের পাপড়ি আছে : উহারা পরস্পর জুড়িয়া গিয়া ঘণ্টার মত হইয়াছে

(৫নং চিত্র, ক, গ)। পুরুষ-ফুলে কেবল পুংকেশর চক্র আছে। পুংকেশর সংখ্যায় পাঁচটি, কিন্তু উহাদের সূত্রগুলি পরস্পর যুক্ত হইয়া তিনটি সূত্রের মত হইয়াছে (৫নং চিত্র, খ)। পুংকেশরের পরাগকোষগুলি পরস্পর জোড়া এবং হলুদ রংয়ের পরাগে ঢাকা থাকে। স্ত্রী-ফুলে কেবল গর্ভকেশর চক্র আছে। এইপ্রকার ফুল বাহির হইতে দেখিলেই চেনা যায়। গর্ভকোষটি গোলাকার, বেশ বড়, বৃতি ও দলের নীচে বাহিরের দিকে থাকে (৫নং চিত্র, ক, খ)। ইহা দেখিতে সবুজ রংয়ের এবং ইহাই পরে কুমড়ায় পরিণত হয়। দলের ভিতর ফুলের মাঝখানে একটি ছোট গর্ভদণ্ড এবং উহার আগায় তিনটি গর্ভমুণ্ড আছে ; প্রত্যেক মুণ্ডটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। গর্ভকেশর চক্রটি তিনটি গর্ভকেশর লইয়া গঠিত। উহারা পরস্পর জুড়িয়া একটি গর্ভকোষ, একটি গর্ভদণ্ড ও তিনটি গর্ভমুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। গর্ভকোষে অসংখ্য ডিম্বকোষ আছে যাহা হইতে ভবিষ্যতে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন

১। সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল কাহাকে বলে ?
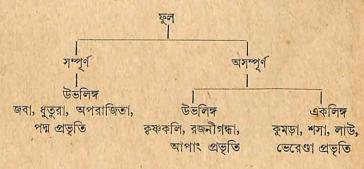
২। উভলিঙ্গ ও একলিঙ্গ ফুল কাহাকে কহে ?

৩। একটি সম্পূর্ণ ফুল বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ফুল-সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহ-পুস্তক প্রস্তুতি

ফুল চিনিবার সহজ উপায় হইল সারা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে নানা রকমের ফুল সংগ্রহ করা এবং উহাদের পরীক্ষা করিয়া বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা। ফুল সংগ্রহ করিবার সময় ঐ সকল গাছের পাতা ফুল ও ফল সমেত ছোট ডাল বা শাখা, অথবা ছোট ছোট গাছ সংগ্রহ করা উচিত। উহাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ব্লটিং কাগজের মধ্যে ভাল করিয়া সাজাইয়া দুইটি চেরাই কাঠের ছালটের মধ্যে রাখিবার পর উহাদের উপর কোনও কিছু ভারী জিনিস চাপা দিয়া রৌদ্রে শুখাইতে হইবে। প্রত্যহ একবার করিয়া ব্লটিং কাগজ বদল করিলে ভাল হয়। এইরূপে প্রায় ৮।১০ দিন রৌদ্রে রাখার পর যখন পাতা, ফুল প্রভৃতি বেশ ভাল শুখাইয়া যাইবে তখন শক্ত ও মোটা কাগজের মাঝারি রকমের একটি খাতার প্রত্যেক

৬। ফুলের সংগ্রহ-পুস্তকের নমুনা

পাতার উপর শুখনা ফুল সমেত ডালগুলিকে পৃথকভাবে আঠা দিয়া আটকাইতে হইবে অথবা মাঝে মাঝে সূতা দিয়া উহাদের কাগজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। আঠার সঙ্গে কিছু তুঁতের গুঁড়া

মিশাইয়া দিলে পাতা বা ফুলগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারিবে না। কাগজের নীচে প্রত্যেক গাছের নাম, সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও কোনও বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা লিখিয়া রাখা উচিত। এইরূপে দুই তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ফুল সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে নিজেদের গ্রাম বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের প্রায় অধিকাংশ ফুল ও গাছ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছে। পরে যদি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় তখন একটি ফুল উহা হইতে পৃথক করিয়া গরম জলে কয়েক মিনিট ফুটাইলে ফুলটি নরম হইয়া যাইবে ; তখন উহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না।

প্রশ্ন

১। ফুল কিরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় ?

২। ফুল সংগ্রহ করিবার দরকার কি ?

চতুর্থ অধ্যায়

পরাগ-মিলন

সাধারণতঃ বীজ না হইলে গাছ বংশ-রক্ষা ও বংশ-বিস্তার করিতে পারে না। ফুল ফুটিলে গর্ভকেশরের সহিত নানা উপায়ে পরাগের মিলন ঘটে এবং কালে নানারকম জটিল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গর্ভকোষ ও ডিম্বকোষ যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়। গর্ভকেশরের মুণ্ডের সহিত পরাগের এই সংযোগকে পরাগ-মিলন বলে। মৌমাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ, বায়ু ও জল দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে এই পরাগ-মিলন ঘটিয়া থাকে। মৌমাছি বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের সাহায্যে যাহাদের

পরাগ-মিলন ঘটিয়া থাকে সেইসকল ফুলের রেণুর গা আঠার মত চট্‌চটে ও উহার গায়ে ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাঁটা থাকে। সেই কারণে উহারা মৌমাছি বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের গায়ে সহজে লাগিয়া যায়। উহাদের আকৃষ্ট করিবার জন্য ফুলগুলির বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং রেণু, মধু, রস প্রভৃতি নানারূপ খাবারের প্রলোভন দেখাইয়া উহারা মৌমাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গকে ফুলে আকর্ষণ করে। ফুলের বর্ণে ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুর লোভে যখন মৌমাছি এক ফুল হইতে অপর ফুলে যায় তখন তাহাদের গায়ে, পায়ে ও ডানায় পরাগ লাগিয়া যায়। এইরূপে ফুলের পরাগ মাখিয়া মৌমাছি আবার অন্য ফুলে মধু পান করিতে যায়। তখন পরাগ ঐ ফুলের গর্ভ-কেশরের মুণ্ডে লাগিলে পরাগ-মিলন ঘটে। কাজ শেষ হওয়ায় পাপড়ি, পুংকেশর প্রভৃতি ফুলের বিভিন্ন অংশ ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়ে এবং ফুল হইতে ফল বাহির হয়। এই ফলের মধ্যে বীজ থাকে। ফল পাকিলে বীজগুলি নানা উপায়ে ছড়াইয়া পড়ে এবং ঐ বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে।

ধান, গম, যব, তাল প্রভৃতি গাছের বাতাসের সাহায্যে পরাগ-মিলন হইয়া থাকে। এই সব গাছের ফুল সাধারণতঃ ছোট হয় এবং উহাদের উজ্জ্বল রং, গন্ধ বা মধু থাকে না। উহাদের ফুলের রেণু ছোট, হালকা, মসৃণ এবং শুখনা ধূলার মত হইয়া থাকে। উহারা হালকা বলিয়া সহজেই বাতাসে উড়িয়া যায় এবং নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পরাগ ধরিবার জন্য গর্ভদণ্ডটি লম্বা এবং গর্ভমুণ্ড শাখা ও কেশযুক্ত হয়। সেইজন্য উহারা সহজেই বাতাসে উড়া রেণু ধরিতে পারে।

পাটাশেওলা প্রভৃতি কয়েকটি জলজ গাছের জলের সাহায্যে পরাগ-মিলন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া শিমুল, পল্‌তে মাদার প্রভৃতি

গাছের পরাগ-মিলন অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা হইয়া থাকে। শিমুলগাছে যখন টক্‌টকে লাল রংয়ের ফুল ফোটে তখন কাক, শালিক প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া ঐ সকল গাছে বসে এবং ফুলগুলিকে ঠোক্‌রাইলে উহাদের পরাগ-মিলন হয়।

প্রশ্ন

১। পরাগ-মিলন কাহাকে কহে? মৌমাছি পরাগ-মিলনে কি কাজ করে?

২। কীট-পতঙ্গ ও বায়ুর দ্বারা যে সব ফুলের পরাগ-মিলন হয় তাহাদের তুলনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃক্ষ

একটি সাধারণ বৃক্ষ পর্য্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে আমগাছ (৭নং চিত্র) সকল জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা **চিরসবুজ** এবং **বহুবর্ষ** বাঁচিয়া থাকে। ইহার গুঁড়ি আছে এবং কাণ্ডের ভিতরের অংশ **শক্ত** ও **কাষ্ঠময়**। কাণ্ডের ত্বক্ বা ছাল পুরু, অমসৃণ ও কাল রংয়ের হইয়া থাকে। আমের একটি ছোট চারাগাছ (৮নং চিত্র) লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহার মূল, যাহা মাটির ভিতর থাকে, ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি **প্রধান মূলের** সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা হইতে অনেক **শাখা-প্রশাখা** বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। এই অবস্থায় প্রধান মূল বা উহার শাখার আগায় **মূলত্র** অথবা **মূলরোম** সাধারণতঃ দেখা যায় না,

কারণ, চারাগাছটি মাটি হইতে খুব সাবধানে না তুলিলে উহারা নষ্ট হইয়া যায়। মাটির উপরে আমগাছের কাণ্ড ও উহার গায়ে অসংখ্য সবুজ রংয়ের **পাতা** আছে। কাণ্ডের নীচের অংশটি গুঁড়ি।
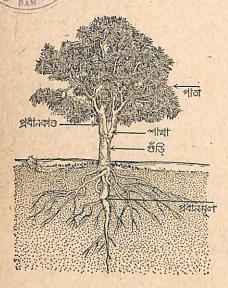
৭। আমগাছের দেহাংশ

প্রধান কাণ্ডের উপরের অংশে অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। একটি কচি শাখা বা প্রশাখা (৯নং চিত্র) লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে পাতাগুলি কাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে বাহির হইয়াছে এবং উহারা বিশেষ কৌশলের সহিত কাণ্ডের গায়ে সাজান আছে, এলোমেলো ভাবে নাই। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে পাতাগুলি যেন একের উপর অন্যটি পড়িয়া পরস্পরকে ঢাকিয়া না রাখে; সেইজন্য সূর্য্যকিরণ প্রত্যেক পাতার উপর পড়িবার কোনও অসুবিধা হয় না। কাণ্ডের যে স্থান হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে **পর্ব্ব** এবং দুইটি পর্ব্বের মাঝখানের অংশটিকে **পর্ব্বমধ্য** বলা হয়। পাতার চওড়া এবং পাতলা অংশ বা **ফলকটি** দেখিতে অনেকটা বল্লমের আগার মত। উহার মাঝখানে একটি **মধ্যশিরা** বহু শাখা-প্রশাখায় ভাগ হইয়া **শিরা** ও **উপশিরার** সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ শিরাবিন্যাসকে **পক্ষশির** বলে। ফলকের নীচে ছোট ডাঁটার মত অংশটির নাম **বৃন্ত** বা বোঁটা। বৃন্তের শেষ

অংশ কিছু মোটা এবং ঐ অংশ দিয়া পাতা কাণ্ডের সহিত জোড়া থাকে। ইহা ছাড়া কাণ্ড ও প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার আগায় এবং পাতার কোলে একটি করিয়া মুকুল আছে।

৮। আমের চারাগাছ

আমগাছে সকল সময়ে ফুল ফোটে না। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে আমগাছে 'বোল' বা **মঞ্জরী** দেখা দেয়। এক একটি মঞ্জরীতে অসংখ্য ফুল থাকে। ফুলগুলি দেখিতে অত্যন্ত ছোট, হলুদ রংয়ের ও তীব্র গন্ধযুক্ত (১০নং চিত্র, গ)। আমগাছে দুই প্রকারের ফুল দেখা যায়, **উভলিঙ্গ** ও **একলিঙ্গ**, এবং ইহারা একই গাছে ফুটিয়া থাকে। প্রত্যেক উভলিঙ্গ ফুলের চারিটি অংশ আছে। কীট-পতঙ্গের সাহায্যে পরাগ-সংযোগের ফলে ফাল্গুন ও চৈত্র-মাসে ফুল হইতে ফল বাহির হয়, কিন্তু সকল ফুল হইতে ফল হয় না। সেই কারণে পুষ্পমঞ্জরীর শাখার আগায় সাধারণতঃ একটি করিয়া ফল ধরে (১০নং চিত্র, ক)।
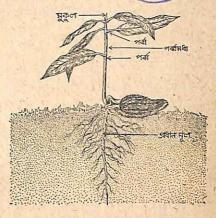
৯। আমগাছের শাখা-প্রশাখা

একটি আম লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে ফলের ত্বকটি বেশ রসাল ও মোটা এবং উহার মাঝখানে একটি বীজ আছে

(১০নং চিত্র, খ)। ইহার **ফলত্বক্‌টিকে** তিনটি অংশে পৃথক করা যায়,—প্রথমে বাহিরের খোসা, মাঝখানে শাঁসাল সরস অংশ এবং ভিতরকার অংশটি শক্ত আঁটি। এই আঁটির মধ্যেই বীজটি থাকে। আম **রসাল, অস্ফোটক** এবং **মৌলিক** ফল। ইহা পাকিলে ফাটিয়া যায় না। আমের ফুলে একটি মাত্র গর্ভকোষ থাকে এবং উহা হইতে একটি ফলের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহাকে মৌলিক ফল বলা হয়।
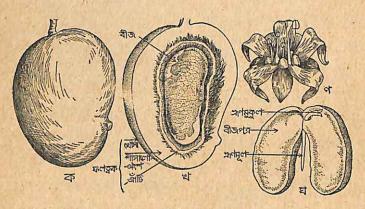
১০। আমগাছের ফুল (গ), ফল ও বীজ (ক, খ) এবং ভ্রূণ বা উদ্ভিদ্‌শিশু (ঘ)

আমের বীজ একটি পাতলা সাদা রংয়ের **খোসার** দ্বারা ঢাকা থাকে। এই খোসাটি ছাড়াইলে উহার মধ্যে উদ্ভিদ্‌-শিশু বা ভ্রূণ (১০নং চিত্র, ঘ) দেখিতে পাওয়া যায়। একটু চাপ দিলে ভ্রূণটি দুইটি মোটা অংশে ভাগ হইয়া যায়; এই দুইটিকে **বীজপত্র** বলে। বীজপত্র দুইটি একটি সরু কাঠির ন্যায় অংশের মাঝখানে জোড়া থাকে। ইহার যে অংশটি বাহিরের দিকে থাকে তাহাকে **ভ্রূণমূল** অথবা ভাবীমূল এবং যে অংশটি

বীজপত্র দুইটির মাঝখানে থাকে তাহাকে **ভ্রূণমুকুল** অথবা ভাবীকাণ্ড বলে। বীজপত্র, ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল লইয়াই ভ্রূণটি গঠিত। বীজপত্রের মধ্যে উদ্ভিদ্-শিশুর খাদ্য জমা থাকে বলিয়া উহারা দেখিতে মোটা। অনুকূল অবস্থায় এই ভ্রূণ হইতে নূতন আমগাছ জন্মিয়া থাকে।

মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল এবং বীজ আমগাছের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহাদের দ্বারা গাছের পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশ-রক্ষা ও বংশ-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। ফুল ও ফল গাছে বেশিদিন স্থায়ী হয় না ; কাজ শেষ হইলেই উহারা গাছ হইতে খসিয়া পড়ে।

বৃক্ষের শাখাবিন্যাস

শাখা-প্রশাখা কাণ্ডের গায়ে এলোমেলো ভাবে সাজান থাকে না ; সাধারণতঃ উহারা কাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট স্থান ও পাতার কোল হইতে বাহির হয়। কাণ্ডের গায়ে শাখার এই সুশৃঙ্খল অবস্থানকে **শাখাবিন্যাস** বলে। সাধারণতঃ পাতার কোলের মুকুল বাড়িলে শাখার উৎপত্তি হয়। প্রধান কাণ্ডের ও শাখা-প্রশাখার আগার মুকুল বাড়িলে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা দীর্ঘ হয়। প্রথম প্রথম প্রধান কাণ্ড শাখা-প্রশাখার তুলনায় বেশি বাড়ে। ইহাতে প্রধান কাণ্ড অধিক দীর্ঘ ও মোটা হয় এবং শাখা-প্রশাখাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরু থাকে। দেবদারু (১১নং চিত্র, গ) গাছে এইরূপ শাখা-বিন্যাস দেখা যায়। বট, অশ্বত্থ (১১নং চিত্র, খ) প্রভৃতি বৃক্ষে প্রধান কাণ্ড ও শাখার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে কোনটি প্রধানকাণ্ড ও কোনগুলি শাখা তাহার প্রভেদ বুঝা যায় না। কাণ্ডের শাখা হইতে ক্রমে প্রশাখা বাহির হইয়া বৃক্ষটিকে আরও প্রকাণ্ড করিয়া তোলে। আবার কোন কোন

উদ্ভিদের শাখাবিন্যাস-পদ্ধতি অন্যরকম। এই সকল বৃক্ষের প্রধান
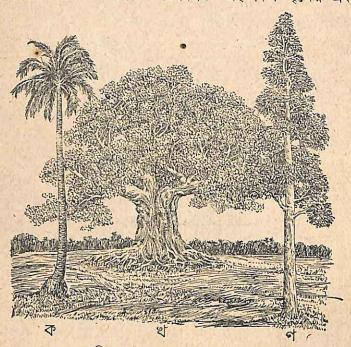
১১। নারিকেল (ক), অশ্বত্থ (খ) ও দেবদারু (গ) গাছ

কাণ্ডের আগার মুকুলের বৃদ্ধি শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার তুই পাশের মুকুল বাড়িয়া শাখার সৃষ্টি করে।

বৃক্ষের শাখা ও মুকুল পর্য্যবেক্ষণ

শাখা ও মুকুল—চাঁপা (১২নং চিত্র), কাঁঠাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের কয়েকটি ছোট ছোট কচি শাখা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে শাখাগুলির নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে পাতাগুলি বাহির হইয়াছে ; উহারা এলোমেলো ভাবে সাজান নাই। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিকে **পর্ব্ব** এবং

দুইটি পর্ব্বের মাঝখানের অংশকে **পর্ব্বমধ্য** বলা হয়। ইহা ছাড়া প্রধান কাণ্ড এবং প্রত্যেক শাখার আগায় ও পাতার কোলে একটি করিয়া **মুকুল** আছে। পাতার কোলের মুকুল হইতেই শাখা-প্রশাখা ও ফুলের কুঁড়ি বাহির হয় এবং উহাদের গায়ে পাতা সাজান থাকে। প্রধান কাণ্ড বা শাখার আগার মুকুলই বাড়িয়া থাকে। পাতার কোলের সকল মুকুলই বাড়ে না; অনেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। প্রয়োজন মত বাড়িয়া উহারা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে পারে।
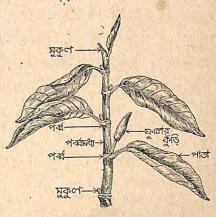
১২। বৃক্ষের শাখা ও মুকুল

কাণ্ডের বা শাখা-প্রশাখার আগার মুকুল বা **শীর্ষমুকুল** কোনরূপে নষ্ট হইলে উহারা আর বাড়িতে পারে না। পাতার কোলের মুকুল বা **পার্শ্বমুকুল** না বাড়িলে কাণ্ড শাখাহীন থাকে। তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ শাখাহীন কাণ্ডের উত্তম উদাহরণ।

বৃক্ষের ত্বক্

বৃক্ষের ত্বক্ বা ছাল বলিতে সাধারণতঃ কাণ্ডের বাহিরের আবরণকে বুঝায়। কচি শাখার ছাল প্রথমে পাতলা ও সবুজ রংয়ের থাকে। এই অবস্থায় পাতার মত ইহাও কিছুটা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। বৃক্ষের বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই ছাল মরিয়া যায় ও ইহার স্থানে নূতন ছাল জন্মে। ইহা সাধারণতঃ পুরু এবং ইহার রং ও আকার

নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তখন ইহা সহজে ভিজিয়া যায় না এবং কাণ্ডের ভিতরকার অংশকে শীত, বৃষ্টি, তাপ, নানাপ্রকার পরজীবী ছত্রাক ও জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। কোন কোনও বৃক্ষের ত্বকে নানারকম বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া যায় অথবা উহাদের গায়ে কাঁটা থাকে। সেইজন্য জীব-জন্তু প্রভৃতি কাণ্ডের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। বৃক্ষের ত্বক্ হইতে ঔষধ জাতীয় নানারকম পদার্থ, ধুনা, গঁদ প্রভৃতি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়।

জলের মধ্যে গাছের ডাল রাখিয়া উহার পর্য্যবেক্ষণ

কয়েকটি বড় বোতলের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ জল দ্বারা ভরিয়া উহাদের প্রত্যেকটির কাক বা ছিপির মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র করিতে হইবে। বোতলের বাকী অংশ বাতাসের জন্য খালি রাখা উচিত। এইবার পাতা-বাহার (ক্রোটন), গোলাপ, জবা, আম প্রভৃতি গাছের কচি কচি ডাল গাছ হইতে কাটিয়া লইয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে ছিপির ভিতর দিয়া এমন করিয়া বসাইতে হইবে যাহাতে ডালগুলির কাটা অংশের খানিকটা জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে
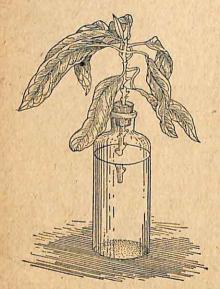
১৩। জলের মধ্যে গাছের ডাল রাখিয়া পরীক্ষা

(১৩নং চিত্র)। জলে ঈষৎ লবণ মিশাইয়া লইলে ভাল হয়। এইভাবে ডালগুলি ঘরের মধ্যে রাখিয়া উহাদের লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ডালগুলি বোতলের জল শুষিয়া লওয়ায় উহাদের পাতাগুলি কয়েকদিন পর্য্যন্ত বেশ সতেজ থাকে; পরে খাদ্যাভাবে উহারা শুকাইয়া ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়ে। অবস্থা অনুকূল হইলে পাতাবাহার প্রভৃতি কয়েকটি গাছের ডালের কাটা অংশ হইতে কিছুদিনের মধ্যে জলের ভিতর ছোট ছোট শিকড় বাহির হয়। তখন ডালটিকে বোতল হইতে বাহির করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে উহা হইতে নূতন গাছ পাওয়া যায়।

মূল ও কাণ্ডের তুলনা

মূল	কাণ্ড
১। সাধারণতঃ মাটির নীচে থাকে এবং খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে মাটির ভিতরের দিকে বাড়ে।	১। সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে এবং সূর্য্যকিরণে পাতাগুলিকে ধরিবার জন্য উপরের দিকে বাড়ে।
২। পাতা, মুকুল, পর্ব্ব ও পর্ব্বমধ্য থাকে না এবং ফুলও ধারণ করে না।	২। পাতা, মুকুল, পর্ব্ব ও পর্ব্বমধ্য থাকে এবং ফুলও ধারণ করে।
৩। আগায় মূলত্র থাকে।	৩। আগায় মুকুল থাকে।

প্রশ্ন

১। একটি সাধারণ বৃক্ষের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখ।

২। মূল ও কাণ্ডের তুলনা কর।

৩। বৃক্ষের শাখা-বিন্যাস কাহাকে বলে ও উহা কিরূপে হইয়া থাকে?

৪। বৃক্ষের একটি ছোট শাখার বর্ণনা লিখ। মুকুল কাহাকে বলে? উহার কাজ কি?

৫। বৃক্ষের ত্বক্ কাহাকে বলে? উহার প্রয়োজন কি?

৬। জলের মধ্যে গাছের ডাল রাখিলে উহার কি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফসল কাটিবার পদ্ধতি; উহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

চাষ-আবাদের দ্বারা যে সব 'শস্য' পাওয়া যায় তাহাদের 'ফসল' বলে। খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ফসলের চাষ-আবাদও আমাদের দেশে হইয়া থাকে। ইহারা অর্থকরী ফসল, যেমন—পাট, শণ, কার্পাস, রেড়ি প্রভৃতি।

ফসল কাটিবার পদ্ধতি—ফসল কাটিবার পদ্ধতি বা রীতি সকল ফসলের সমান নহে। ফসলের যে অংশ আমাদের কাজে লাগে সেই অংশ পূর্ণ-পরিণত হইলে ফসল কাটিতে হয়। শাক-সব্জীর মূল, কাণ্ড বা ডাঁটা, পাতা প্রভৃতি কচি অবস্থায় কাটিয়া লইতে হয়; কিন্তু ঐ সকল ফসলের বীজ পাইতে হইলে উহাদের ফলগুলি সুপরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করিতে হয়, তাহার কারণ অপুষ্ট বীজ হইতে কখনও ভাল ফসল পাওয়া যায় না। ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য, মুগ, মসূর প্রভৃতি ডালশস্য এবং সরিষা, রেড়ি, চীনাবাদাম, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ পাইতে হইলে উহাদের ফল ও বীজ সুপরিপক্ক না হইলে ফসল কাটিতে নাই। ধান, যব, গম প্রভৃতির ফল ভালভাবে

পাকিবার পর গাছগুলি যখন হেলিয়া পড়ে তখন কাস্তে দিয়া উহাদের গোড়া হইতে কাটিয়া, আঁটি বাঁধিয়া ও নিয়মিত ভাবে রৌদ্রে রাখিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক করা হয়। পরিপক্ক বীজওয়ালা 'শুঁটি' হইতে ফলগুলি ফাটিবার আগেই মুগ, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ডালশস্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। আলু পরিপুষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা কোদাল দিয়া ভালভাবে ফসল উঠান যায়, কারণ ইহার দ্বারা আলুতে আঘাত লাগে না। পাটগাছের ফুল হইতে যখন ফল ধরা আরম্ভ হয় তখনই ফসল কাটার উপযুক্ত সময়। ইহার আগে কাটিলে আঁশ সূক্ষ্ম হয় কিন্তু ফসল কম হইয়া থাকে। আবার ফসল পরিপক্ক হইলে ফসল বেশি পাওয়া যায় কিন্তু আঁশ মোটা হয়। বড় কাঁচির সাহায্যে পাট গাছের গোড়ায় কাটিয়া আঁটি বাঁধা হইয়া থাকে। তূলার ফলগুলি পাকিয়া ফাটিতে আরম্ভ করিলেই একপক্ষ অন্তর তিন চার বারে পরিষ্কার ভাবে ফলগুলি কাটিতে হয় এবং যাহাতে একপশলা বৃষ্টি হইয়া পাকা তূলা নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শস্যের জন্য নানাপ্রকার ফসল কাটিবার রীতি এদেশে প্রচলিত আছে।

ফসল-সংগ্রহ—ফসলগুলিকে উহাদের বুনিবার ও কাটিবার সময় হিসাবে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা—**ভাদুই** এবং **রবি**। ভাদুই-শস্য সাধারণতঃ শীতের পর বোনা হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ বুনিবার প্রশস্ত সময়। ইহারা বর্ষাকালে জন্মে এবং ভাদ্রমাসে ইহাদের ফসল কাটা হয়। যে সকল ফসল সাধারণতঃ বর্ষার পর এবং শীতের প্রথমে বোনা হয় তাহাদের রবি-শস্য বলে। রবি-শস্যের পক্ষে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস বীজ বুনিবার উৎকৃষ্ট সময়। মাঘ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত নানারকমের রবি-শস্যের ফসল পাকিয়া থাকে।

ভাদুই-ফসল		রবি-ফসল	
ফসলের নাম	ফসল সংগ্রহের সময়	ফসলের নাম	ফসল সংগ্রহের সময়
১। **খাদ্যশস্য**		১। **খাদ্যশস্য**	
আউশ ধান	শ্রাবণ—আশ্বিন	গম	ফাল্গুন—বৈশাখ
আমন ধান	কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ	যব	চৈত্র
২। **ডালশস্য**	× ×	২। **ডালশস্য**	
		মুগ	পৌষ
		বিরিকলাই	অগ্রহায়ণ—মাঘ
		খেসারী, মসুর,	ফাল্গুন
		ছোলা ও মটর	ফাল্গুন—বৈশাখ
৩। **মসলা**		৩। **মসলা**	
হলুদ ও আদা	অগ্রহায়ণের মধ্যে	পিঁয়াজ	ফাল্গুন
লঙ্কা	পৌষ—ফাল্গুন	ধনে ও মৌরী	পৌষ—চৈত্র
গোলমরিচ	ভাদ্র—আশ্বিন		
৪। **তৈলবীজ**		৪। **তৈলবীজ**	
চীনাবাদাম	অগ্রহায়ণ—মাঘ	সরিষা	ফাল্গুন
রেড়ি	অগ্রহায়ণ হইতে	চীনাবাদাম	চৈত্র
		রেড়ি	জ্যৈষ্ঠ হইতে
৫। **অন্যান্য শস্য**		৫। **অন্যান্য শস্য**	
আখ	ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে—	শণ	ফাল্গুন—চৈত্র
পাট	জ্যৈষ্ঠ—ভাদ্র	কার্পাস	ফাল্গুন—চৈত্র

সুতরাং মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাস ইহাদের ফসল কাটিবার ও সংগ্রহ করিবার সময়। এমন কতকগুলি ভাদুই ও রবি ফসল আছে যাহারা ঠিক মত এই সময়ের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না ; কিছু আগে বা পরে উহারা জন্মিয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও শাকসব্জীর মধ্যে শিম, কচু, মানকচু, ওল এবং নটে, পুঁই প্রভৃতি ডাঁটা ও শাক ভাদুই-শস্য হিসাবে এবং বেগুন, পটোল, আলু, কুমড়া, মূলা, ঝিঙ্গা, পালম শাক প্রভৃতি রবি-শস্য হিসাবে আমরা পাইয়া থাকি। ফলের মধ্যে কলা, আনারস ও পেঁপে ভাদুই-শস্য এবং তরমুজ, ফুটি, খরমুজা প্রভৃতি রবি-শস্য হিসাবে এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফসল-সংরক্ষণ—আমাদের দেশে নানা কারণে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ইহা বন্ধ করিতে না পারিলে ফসলের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব নয়। আগাছার উপদ্রব, ছত্রাক, জীবাণু ও পোকার আক্রমণ, ফসল কাটা, বহন করা ও 'মাড়াই' করিবার সময় অসাবধানতা, এবং গুদামে ফসল-সংরক্ষণের ত্রুটি, ইহার যে কোন একটি কারণের জন্য ফসলের অনেক ক্ষতি হইতে পারে। জমি হইতে আগাছা উঠাইয়া ফেলিলে যে খরচ পড়ে তাহার তুলনায় অনেক বেশি ফসল পাওয়া যায়। এই সব আগাছায় ফসলের রোগকারী ছত্রাক বাঁচিয়া থাকে ; ক্রমে উহারা ফসলে ছড়াইয়া পড়ে। ভাল ফল বা বীজকে রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সময়মত তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আজকাল ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সাহায্যে নানাপ্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে ফসলকে রক্ষা করা যায়। বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা আছে ; এমন কোনও একটি ঔষধ নাই যাহার দ্বারা সকল রকম রোগ বা কীটের আক্রমণ হইতে ফসলকে

রক্ষা করা যাইতে পারে। ফসল কাটিবার, ক্ষেত হইতে খামার বা গুদামে লইয়া যাইবার ও শস্য 'মাড়াই' করিবার সময় অসাবধানতার জন্য যাহাতে ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া গুদামে ফসল রক্ষা করিবার ত্রুটির জন্য শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ শস্য নষ্ট হইয়া যায়। কৃষকদের ধীরে ধীরে শস্য মজুত করিবার উন্নত প্রণালী শিখিয়া লইতে হইবে এবং শস্যের অপচয় বন্ধ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। ফসল রক্ষা করিবার জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা না হইলে বহু শস্য অপচয় হইতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি যাহাতে শস্যের ক্ষতি করিতে না পারে সেজন্য উন্নত ধরণের গুদাম প্রস্তুত করা উচিত। ইহাতে বায়ু-চলাচলেরও সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। এইরূপ নানা উপায়ে অপচয়ের হাত হইতে শস্যকে বক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন

১। ফসল কাহাকে বলে ?

২। ফসল কাটিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান তাহা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৩। রবি ও ভাদুই শস্য কাহাকে বলে ? কয়েকটি খাদ্যশস্য ও ডালশস্যের ফসল সংগ্রহ করিবার সময় সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৪। ফসল-সংরক্ষণ কাহাকে বলে ? কি কি কারণে ফসল সাধারণতঃ নষ্ট হইয়া থাকে ? তাহার প্রতিকারের উপায় কি ?

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা

প্রাণিজগৎ—পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। প্রাণীদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সকল প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে, যেমন, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী, গরু, কুকুর ইত্যাদি, তাহাদিগকে **মেরুদণ্ডী** প্রাণী বলা হয়। আর যাহাদের মেরুদণ্ড নাই তাহাদিগকে **অমেরুদণ্ডী** প্রাণী বলে, যেমন, কেঁচো, মশা, মাছি, মাকড়সা, শামুক প্রভৃতি।

অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনা

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
১। মেরুদণ্ড নাই।	১। মেরুদণ্ড আছে।
২। খালি চোখে দেখা নাও যাইতে পারে।	২। খালি চোখে দেখা যাইবেই।
৩। সংখ্যায় অমেরুদণ্ডী প্রাণী অনেক বেশি।	৩। সংখ্যায় মেরুদণ্ডী প্রাণী অনেক কম।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

পতঙ্গ

মশা, মাছি, পঙ্গপাল, পিঁপড়া, মৌমাছি, প্রজাপতি, উই প্রভৃতি সকলেই পতঙ্গ। উহারা একপ্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রাণিজগতের প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগই পতঙ্গ।

পতঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পতঙ্গের দেহে তিনটি অংশ আছে, যথা—(১) মাথা, (২) বুক ও (৩) পেট। প্রত্যেকের মাথায় এক

জোড়া করিয়া শুঁড় এবং এক জোড়া চোখ থাকে। শুঁড় দিয়া ইহারা নানা জিনিস অনুভব করিতে পারে। একটি চোখ আবার হাজার হাজার ছোট ছোট চোখের সমষ্টি। পতঙ্গের বুকে তিনটি অংশ দেখা যায় এবং প্রত্যেক অংশে এক জোড়া করিয়া পা থাকে; তাহা হইলে প্রত্যেক পতঙ্গের পায়ের সংখ্যা হইল মোট ছয়টি। পতঙ্গের কাহারও কাহারও এক বা দুই জোড়া করিয়া **পাখা** থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ **স্ত্রী-পুরুষ** ভেদ দেখা যায়।

উপকারী পতঙ্গ

(১) প্রজাপতি

সচরাচর দুই প্রকারের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) **প্রজাপতি** ও (২) **রাত-প্রজাপতি** বা **মথ**। প্রজাপতি দেখিতে সুন্দর; উহার শরীর রোগা এবং উহারা দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায় (১৪নং চিত্র)। উহারা যখন কোথাও বসে তখন উহাদের পাখা নৌকার পালের মত পিঠের উপর উঁচু হইয়া থাকে। উহাদের শুঁড়ের আগা মোটা ও দেখিতে কতকটা গদার মত। মথেরা রাত্রিতে বাহির হয়। উহারা যখন কোথাও বসে তখন উহাদের পাখা পিঠের উপর ছড়ান থাকে (১নং চিত্র)। উহাদের শুঁড়ের আগা ও শেষ অংশটি সরু কিন্তু উহার মধ্যভাগ মোটা হয়। উহাদের দেহ দেখিতে মোটা এবং আদৌ সুন্দর নয়।

প্রজাপতির মুখে একটা নল ঘড়ির স্প্রিংএর মত জড়ান থাকে। নলটির পাক খুলিয়া সোজা করিয়া উহারা ফুলের মধু ও ফলের রস শুষিয়া খায়।

প্রজাপতির রূপান্তর—স্ত্রী-প্রজাপতি একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। এই ডিম গাছের পাতায় প্রায়ই দেখা যায়। ডিম হইতে বাচ্চা সময়মত বাহির হয়। এই বাচ্চাকে আমরা শূক, শুঁয়াপোকা বা **লার্ভা** বলি। শুঁয়াপোকার মুখে দাড়া, দেহে অসংখ্য কাঁটা এবং অনেক পা থাকে। উহাদের গায়ের রং নানাপ্রকার হইয়া থাকে। শুঁয়াপোকা কামড়াইতে পারে কিন্তু প্রজাপতি কামড়াইতে পারে না।

১৪। প্রজাপতি

শুঁয়াপোকা ডিম হইতে বাহির হইয়াই গাছের সবুজ পাতা খাইতে থাকে ; উহারা অত্যন্ত পেটুক। কিছুদিন পরে খাওয়া বন্ধ করিয়া উহারা শরীরের বাহিরে একটি আবরণ বা গুটি প্রস্তুত করে। কোনও কোনও প্রজাপতির শুঁয়াপোকা গুটি প্রস্তুত করে না। গুটির মধ্যে প্রবেশ করিবার বা উহা হইতে বাহির হইবার কোন রাস্তা নাই। গুটির মধ্যে শুঁয়াপোকা কিছুই খায় না। এই সময়ে উহাদের শরীরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং উহার এই অবস্থাকে **পিউপা** বলে। পিউপা ক্রমে পূর্ণপরিণত প্রজাপতি বা রাত-প্রজাপতি হইয়া গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

যে গুটি হইতে রেশম উৎপন্ন হয় তাহাকে পলু বলে। গুটির মধ্যে পিউপা থাকে। রেশম বা গরদ চার প্রকার পলু হইতে পাওয়া যায়, যথা,—(১) রেশম বা গরদ পলু, (২) তসর-পলু, (৩) এণ্ডি-পলু ও (৪) মুগা-পলু।

প্রশ্ন

১। প্রজাপতির দেহের বিশেষত্ব কি ?
২। প্রজাপতির রূপান্তরের বর্ণনা কর।
৩। প্রজাপতি কি করিয়া রেশম তৈয়ার করে ?

(২) গুটিপোকা

গুটিপোকা হইতে রেশম-সূতা পাওয়া যায়; ইহা একপ্রকার মথ বা রাত-প্রজাপতি (১৫নং চিত্র)। গুটিপোকার জীবনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যথা,—(১) **ডিম**, (২) **শুঁয়াপোকা বা লার্ভা**, (৩) **পিউপা** ও (৪) **রাত-প্রজাপতি**। ডিম ফুটিলে লার্ভা শাল, অর্জ্জুন ও কুল পাতা খাইয়া বড় হয়। লার্ভা কয়েকবার খোলস ছাড়ে এবং মুখের লালা বাহির করে। সেই লালা দেখিতে সূতার মত সরু এবং উহা শুকাইলে রেশম-সূতায় পরিণত হয়। গুটিপোকার লার্ভা ঐ সূতা দিয়া নিজের দেহের চতুর্দ্দিকে একটি আবরণ বা গুটি তৈয়ার করে। পরে গুটির মধ্যে বার কয়েক খোলস ছাড়িয়া লার্ভা পিউপায় রূপান্তরিত হয়। অসহায় পিউপার রক্ষার জন্যই গুটির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই গুটিকে গরম জলে ডুবাইয়া এবং পিউপাকে মারিয়া আমরা রেশম ও তসর সূতা পাইয়া থাকি। পিউপাকে না মারিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিলে পিউপা রাত-প্রজাপতি হইয়া গুটির রেশম কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

১৫। গুটিপোকার লার্ভা (উপরে) ও মথ (নীচে)

প্রজাপতি ও মথের তুলনা

প্রজাপতি	রাত-প্রজাপতি বা মথ
১। দেখিতে সুন্দর।	১। দেখিতে সুন্দর নয়।
২। শরীর রোগা।	২। শরীর মোটা।
৩। বসিলে পাখা নৌকার পালের মত পিঠের উপর উঁচু হইয়া থাকে।	৩। বসিলে পাখা পিঠের উপর ছড়ান থাকে।
৪। শুঁড়ের আগা মোটা গদার মত।	৪। শুঁড়ের আগা ও শেষটা সরু, মাঝখানটা মোটা।
৫। কেহ কেহ রেশম তৈয়ার করিতে পারে।	৫। ব্যবহারযোগ্য রেশম ইহারাই তৈয়ার করে।

প্রশ্ন

১। গুটিপোকার জীবনী বর্ণনা কর।

২। প্রজাপতি ও মথের তুলনা কর।

(৩) মৌমাছি

মৌমাছি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক (১৬নং চিত্র)। পুরুষ-মৌমাছির আকার ও চোখ দুইটি বেশ বড়। রাণীর মাথা পুরুষের মাথার মত বড় নয়, কিন্তু উহার পেট অত্যন্ত লম্বা হয়। শ্রমিক-মৌমাছি পুরুষ বা রাণী অপেক্ষা আকারে ছোট। শ্রমিকদের পেটের শেষে হুল থাকে। শত্রুর আক্রমণ হইতে উহারা এই হুলের দ্বারা নিজেদের রক্ষা করে। হুলে একপ্রকার বিষ থাকে। উহা শরীরে প্রবেশ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। পুরুষ-মৌমাছির মোটেই হুল থাকে না। রাণীর ছোট হুল থাকিলেও উহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।

মৌমাছির দেহ—শ্রমিক-মৌমাছির দেহে অনেক শুঁয়া থাকে। ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিবার সময় শুঁয়ায় পরাগ লাগিয়া যায়। শ্রমিক-মৌমাছিদের পিছনের পায়ের লোম দেখিতে অনেকটা চিরুণীর দাঁতের মত। এই চিরুণী দিয়া-উহারা সর্ব্ব শরীর আঁচড়াইয়া ফুলের পরাগ পায়ের এক অংশে একটি থলির মধ্যে জমা করে; ইহাকে পরাগ রাখা ঝুড়ি বলে। এই ঝুড়ি পায়ের চিরুণীর সামনে থাকে। এই পরাগ উহারা ঝুড়ি করিয়া বহিয়া আনিয়া শেষে মৌচাকে জমা করে।

১৬। মৌমাছি
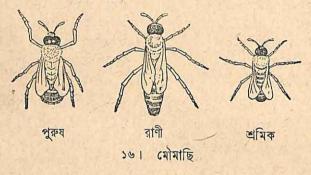
মৌমাছির রূপান্তর—শ্রমিক-মৌমাছিরা অনেকদিন বাঁচে না; দুই-তিন মাসের মধ্যেই ইহাদের মৃত্যু হয়। রাণী এক হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পুরুষ এবং রাণী-মৌমাছি আকাশ বিহারের সময় শূন্যে উড়িতে থাকে। এ অবস্থায় ইহাদের অনেককেই পাখীতে খাইয়া ফেলে; আবার অনেকে সাধারণ ভাবেও মারা যায়। এই সময় কতকগুলি শ্রমিক-মৌমাছিও তাহাদের সঙ্গে থাকে। শ্রমিকেরা রাণী-মৌমাছিকে পুরাতন চাকে ফিরাইয়া আনে অথবা উহাকে নূতন চাকে লইয়া যায়। তারপর রাণী ডিম পাড়ে।

রাণী শিশু-মৌমাছিদের একেবারেই লালনপালন করে না। শ্রমিকেরাই তাহাদের ভার লয়। শিশু-মৌমাছি তখন শ্রমিক-

মৌমাছিদের মুখের রস খাইয়া থাকে। যে সকল শিশু-মৌমাছি কেবল শ্রমিকদিগের মুখের রস খাইয়া থাকে তাহারাই রাণী হয়। যাহাদিগকে কয়দিন পরে মধু ও পরাগ খাইতে হয় তাহারা শ্রমিক-মৌমাছিতে পরিণত হয়। তিন-চার দিন মধু ও পরাগ খাইবার পর শিশু-মৌমাছি তাহাদের শরীরের বাহিরে একটি গুটি তৈয়ার করে। গুটি-অবস্থায় ইহারা বার দিন থাকে ও তারপর পূর্ণপরিণত শ্রমিক-মৌমাছি গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া আসে।
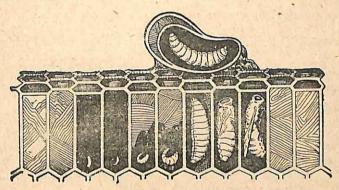
১৭। মৌচাকের মধ্যে মৌমাছির ডিম ও উহার বিভিন্ন অবস্থা

মৌচাক এবং মৌমাছির স্বভাব—বেশি শীতের দেশ ছাড়া সকল দেশেই মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়। মৌচাক ইহাদের বাড়ী (১৭নং চিত্র)। এক একটি বাড়ীতে হাজার হাজার ঘর থাকে। প্রত্যেক ঘরটি দেখিতে ছয় কোণা। মৌচাক মোম দিয়া তৈয়ারী হয়। এই মোম শ্রমিক-মৌমাছির দেহ হইতে বাহির হয় ও উহার পেটের তলায় জমা থাকে। প্রয়োজন মত শ্রমিক-মৌমাছি মুখের লালা মিশাইয়া ইহাকে নরম করে ও পিছনের পায়ের সাহায্যে একটু একটু করিয়া মোম কাটিয়া লয়।

পুরুষ-মৌমাছিরা কোন কাজ করে না। রাণী কেবল ডিম পাড়ে, আর যাহা কিছু কাজ করে ঐ শ্রমিক-মৌমাছির দল। এক একটি চাকে একটি করিয়া রাণী, দুইশত পুরুষ ও বিশ-পঁচিশ হাজার শ্রমিক থাকে। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক চাকে অনেক ডিম ও বাচ্চা থাকে। প্রত্যেকের ঘর আলাদা এবং সকল ঘর দেখিতে এক রকম নয়। বাস করিবার ঘর ছাড়াও প্রত্যেক চাকে অনেক ভাঁড়ার ঘর আছে; উহাতে খাবার জমা থাকে।

মৌমাছিদের প্রধান খাদ্য ফুলের মধু ও পরাগ। মৌমাছি শিশু-অবস্থায় মধু এবং পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় পরাগ খাইয়া থাকে। উহার মুখে ক্ষুদ্র লোমযুক্ত শুঁড় থাকে; তাহা দিয়া মৌমাছি ফুলের মিষ্টরস চুষিয়া লয়। মৌমাছিরা এই মধু চাকে জমা করিয়া রাখে, কখনও বা উহা বাচ্চাদের খাওয়ায়।

প্রশ্ন

১। মৌমাছির দেহের বর্ণনা দাও।

২। মৌমাছির রূপান্তর বর্ণনা কর।

অপকারী পতঙ্গ

(১) পিপীলিকা

সাধারণতঃ তিন প্রকার পিপীলিকা বা পিঁপড়া দেখা যায়, যথা,—**পুরুষ**, **রাণী** ও **শ্রমিক** (১৮নং চিত্র)। পুরুষ-পিঁপড়ার দেহ রাণী-পিঁপড়ার দেহ হইতে ছোট হয়। রাণী-পিঁপড়ার দেহ বেশ বড়। দলে একটির বেশী রাণী থাকে না। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার পিঁপড়া আছে যাহাদিগকে শ্রমিক বলা হয়। তাহাদের দেহ পুরুষ ও রাণী-পিঁপড়ার দেহের আকারের মাঝামাঝি হইয়া থাকে।

পিঁপড়ার দেহ—সাধারণ পতঙ্গের মত পিঁপড়ার দেহেও তিনটি অংশ আছে, যথা,—মাথা, বুক ও পেট। পুরুষ ও স্ত্রী-পিঁপড়ার প্রত্যেকের দুই জোড়া করিয়া ডানা থাকে। স্ত্রী-পিঁপড়া উহার ডানা প্রায়ই ছিঁড়িয়া ফেলে। শ্রমিকের কখনও ডানা থাকে না। এই শ্রমিক-পিঁপড়াকেই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই।

শ্রমিক-পিঁপড়ার মাথা দেখিতে গোল এবং উহার মুখের দুই পাশে দুইটি দাঁড়া আছে। উহাদের যে এক জোড়া শুঁড় থাকে সেই শুঁড় দিয়া পিঁপড়ারা গন্ধ বুঝিয়া জিনিস-পত্র বা পথ চিনিতে পারে। পিঁপড়ার সারির মধ্য হইতে গোটাকতক পিঁপড়াকে সরাইয়া সেস্থান ভাল করিয়া মুছিয়া দিলে সারির পরের পিঁপড়ারা আর আগাইতে পারিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে উহারা চোখে দেখিয়া চলার চেয়ে শুঁড় দিয়া গন্ধ পাইয়া বেশি চলে।

১৮। পিঁপড়ার বিভিন্ন রূপ : ডিম (১), লার্ভা (২), পিউপা (৩), শ্রমিক (৪), পুরুষ (৫) ও রাণী (৬)

পিঁপড়ার রূপান্তর—পিঁপড়ার ডিম সাদা ও ছোট (১৮নং চিত্র, ১); এই ডিম হইতে ক্রিমির মত ছোট ছোট বাচ্চা বাহির হয়। ইহাদিগকে **লার্ভা** বলে (১৮নং চিত্র, ২)। পোষা পাখীতে এই লার্ভা খায় বলিয়া উহা বাজারে বিক্রয় হয়। কিছুদিন পরে লার্ভা উহার শরীরের বাহিরে নিজের লালা দিয়া একটি আবরণ

তৈয়ার করে। ইহাকেই **পিউপা** বলে (১৮নং চিত্র, ৩)। এই পিউপা হইতে ক্রমে একদিন উহার আবরণ ভেদ করিয়া পিঁপড়া পূর্ণপরিণত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে।

পিঁপড়ার স্বভাব—পিঁপড়ার সারি দেখিয়াই বুঝা যায় যে উহারা দল বাঁধিয়া বাস করে। প্রত্যেক দল আলাদা ভাবে থাকে। এক দলের বাড়ীতে অন্য দলের কেহ যায় না। শ্রমিক-পিঁপড়ার ভিতর আবার অনেক ভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের শরীর বেশ শক্ত তাহাদের যোদ্ধা বলে; শত্রু আক্রমণ করিলে তাহারা যুদ্ধ করে। উহারা যদি শত্রুকে হারাইতে পারে তবে তাহাদের ধরিয়া আনিয়া চাকর হিসাবে দলে রাখে। যোদ্ধারা বাড়ীও পাহারা দেয়। বাড়ী পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল কাজই চাকর-পিঁপড়াকে করিতে হয়। খাদ্য-সংগ্রহই উহাদের প্রধান কাজ। স্ত্রী-পিঁপড়াকে রাণী বলা হয়। শ্রমিক-পিঁপড়ারা রাণীকে খুব সেবা করে। রাণী ডিম পাড়ে কিন্তু বাচ্চাদের কোন খবর রাখে না; সন্তান-পালন শ্রমিক-পিঁপড়ার কাজ। রাণী সাধারণতঃ বাড়ীর বাহিরে আসে না। পুরুষ পিঁপড়া অত্যন্ত কুড়ে এবং কোন কাজ করে না। শ্রমিকেরা খুব পরিশ্রম করে। শ্রমিক-পিঁপড়া বাড়ীর বাহিরে আসে ও খাদ্য সংগ্রহ করে। খাদ্য-সংগ্রহের সময় কেহ ঝগড়া করে না। ইহাদের একতা ও একাগ্রতা মানুষকে হারাইয়া দেয়। শ্রমিক-পিঁপড়াদের মধ্যে কেহ কেহ বাড়ী মেরামত করে। ঘরের ভিতর ইহারা অপরিষ্কার দ্রব্যাদি রাখে না। খাওয়ার পর উহারা শস্যের খোলা বা কীট-পতঙ্গের দেহের বাকী অংশ বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

পিঁপড়ার বাড়ী—পিঁপড়া যে কেবল মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে তাহা নহে। কেহ কেহ গাছের পাতা দিয়া সুন্দর বাসা

বাঁধে ; কেহ বা গাছের কোটরে থাকে। কখনও কখনও উহারা ফলের মধ্যে বাস করে। পুরাতন বাড়ীতে না কুলাইলে বা বাড়ী মেরামতের অযোগ্য হইলে দলবদ্ধ ভাবে পুরুষ, রাণী এবং শ্রমিকেরা শিশুদের মুখে করিয়া নূতন বাসায় চলিয়া যায়।

পিঁপড়ার দ্বারা মানুষের অপকার ও উপকার—পিঁপড়া আমাদের অনেক ক্ষতি করে। মিষ্ট জিনিসে উহাদের বড় লোভ। ঐ সকল জিনিস পিঁপড়ার নিকট হইতে রক্ষা করিতে হইলে জিনিসগুলি জলের উপর কোন পাত্রে রাখা উচিত, কারণ পিঁপড়ারা ভাল সাঁতার জানে না। উহারা যে আমাদের শুধু ক্ষতি করে তাহা নহে, অনেকে পোকামাকড় খাইয়া গৃহের বা ক্ষেতের উপকারও করে। বিছানায় বা চেয়ারে ছারপোকা হইলে, পিঁপড়ারা যদি টের পায় তবে ছারপোকার ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি খাইয়া ফেলে।

প্রশ্ন

১। পিঁপড়ার একতা সম্বন্ধে কি জান ? পিঁপড়ারা সাধারণতঃ কোথায় বাস করে ?

২। পিঁপড়ার রূপান্তরের বর্ণনা দাও।

(২) মশা

মশার দেহ—মশা একপ্রকার পতঙ্গ। ইহাদের খুব পাতলা এক জোড়া ডানা থাকে। ইহারা উড়িবার সময় অত্যন্ত শব্দ হয়। প্রত্যেক মশার এক জোড়া শুঁড় থাকে। ইহাদের মাথার সম্মুখে একটি নল আছে ; এবং এই নলের আগায় একটি সূচ থাকে। স্ত্রী-মশা এই নলের সূচ অন্য জন্তু বা মানুষের শরীরে ফুটাইয়া রক্ত শুষিয়া লয়।

সেইজন্য মশা 'কামড়াইতেছে' এই কথাটি ঠিক নয়। মশা কামড়াইতে পারে না, নলের সূচ ফুটাইতে পারে। পুরুষ-মশাদের নলের আগা ভোঁতা ; সেইজন্য উহারা সূচ ফুটাইতে পারে না। ইহারা গাছের রস খাইয়া থাকে।

এনোফিলিস কিউলেক্স

১৯। মশা
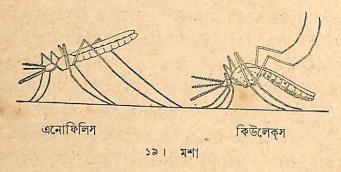
মশার রূপান্তর—মশা জলে ডিম পাড়ে, কিন্তু সকল রকমের মশা যে কোনও জলে ডিম পারিতে পারে না। **কিউলেক্স** মশারা একটু জল পাইলেই তাহাতে ডিম পাড়িতে পারে। এই ডিম হইতে লার্ভা হয় (২০নং চিত্র)। ইহার লার্ভা দেখিতে লম্বা ও উহার মাথা চেপ্টা। লার্ভার চোখ থাকে এবং গায়ে বেশ বড় বড় লোম হয়। পরে এই লার্ভার শরীর কিছু বদল হইয়া বঁড়শীর মত কতকটা বাঁকিয়া যায়। এ অবস্থাতেও উহা জলে থাকে। অবশেষে উহা হইতে ডানা সমেত মশা বাহির হইয়া জল ছাড়িয়া বাতাসে উড়িয়া যায়। লার্ভা অবস্থায় ইহারা যাহা পায় তাহাই খায় ; এমন কি অবস্থা বিশেষে উহারা পরস্পরকেও খাইয়া ফেলে। লার্ভার পেটের শেষ দিকে শ্বাস টানিবার জন্য একটি নল

২০। কিউলেক্স
মশার লার্ভা

থাকে। ঐ নল দিয়া লার্ভা জলের বাহিরের বাতাস লয়। সেইজন্য ইহারা সর্ব্বদা জলের নীচে থাকিলেও শ্বাস লইতে মধ্যে মধ্যে উপরে আসে।

এনোফিলিস মশা কিন্তু যে কোনও জলে ডিম পাড়ে না; বড় পুকুরে বা নদীতে উহারা ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিম এক সঙ্গে অনেকগুলি ভাসে না; লার্ভাও জলের বেশি নীচে যায় না। ইহাদের দেহ জলের উপরিভাগের একটু নীচে সমান্তরালভাবে ভাসিয়া থাকে (২১নং চিত্র)। যথাসময়ে ইহারা পূর্ণাঙ্গ মশার আকার পায়।

২১। এনোফিলিস মশার লার্ভা

রোগবাহী মশা—'ম্যালেরিয়া', 'ফাইলেরিয়া' প্রভৃতি রোগের বীজ মশার দ্বারাই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। **এনোফিলিস** নামক মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। **কিউলেক্স** নামক মশা 'ফাইলেরিয়া' বা গোদের জীবাণু লইয়া আসে। ম্যালেরিয়ার মশা অর্থাৎ এনোফিলিষ যখন কোথাও বসে তখন উহাদের মুখের নল ও পেট এক লাইনে অর্থাৎ সমভাবে রাখিয়া দেহের শেষটা উঁচু করিয়া থাকে (১৯নং চিত্র)। অন্যান্য মশার দেহের শেষটা নীচু হইয়া থাকে ও সেইজন্য উহাদের মুখের নল ও পেট এক লাইনে থাকে না (১৯নং চিত্র)।

এনোফিলিস মশার জীবনের প্রথম অবস্থায় উহার দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকে না। পরে উহা যখন কোনও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে সূচ ফুটায় তখন মশার থুতুর সহিত সেই ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার শরীরে প্রবেশ করে। এই জীবাণু মশার শরীরে সংখ্যায় বাড়ে ও উহার লালা বাহির হওয়ার গ্রন্থিতে বাস করে। পরে যখন এই মশা কোন সুস্থ লোককে নলের সূচ ফুটায় তখন

ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার দেহ হইতে তাহার দেহে প্রবেশ করে। প্রত্যেকবার রক্ত শুষিয়া লইবার পর মশারা থুতু ফেলে যাহাতে রক্ত জমিয়া না যায়। সেই থুতুর ম্যালেরিয়ার জীবাণু তখন লোকের শরীরে প্রবেশ করে। এই জীবাণু রক্তের সহিত মিশিলে লোকের 'ম্যালেরিয়া' জ্বর হয়।

প্রশ্ন

১। মশার দেহের বিশেষত্ব কি ?

২। মশা কি প্রকারে রোগ-জীবাণু বহন করে ?

৩। মশার রূপান্তরের বিষয় কি জান ?

মেরুদণ্ডী প্রাণী

ব্যাঙ

নানাপ্রকার ব্যাঙ ও তাহাদের বাসস্থান—ব্যাঙ নানা জাতীয় হইয়া থাকে। ইহারা জলে, গর্ত্তে, ঝোপে ও গাছের উপরে বাস করে। আমরা সাধারণতঃ তিনপ্রকার ব্যাঙ দেখিতে পাই। যাহারা জলে থাকে তাহাদের শরীর খুব বড় ও পেটের দিকটা হলুদবর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের পিঠে গাঢ় সবুজের উপর কাল কাল ডোরা থাকে। ইহাদিগকে **সোনা** ব্যাঙ বলে (২২নং চিত্র)। সোনা ব্যাঙের গা দেখিতে মসৃণ। যে সব ব্যাঙের গায়ে গুটি থাকে তাহাদিগকে **কুনো** ব্যাঙ বলে (২৩নং চিত্র)। এই গুটি হইতে একপ্রকার রস বাহির হয় যাহা অন্যান্য জন্তুর পক্ষে বিষাক্ত। কুনো ব্যাঙ দেখিতে বিশ্রী। ইহারা সাধারণতঃ ঝোপের ভিতর অথবা নর্দ্দমায় থাকে। যে ব্যাঙ গাছে থাকে তাহাদিগকে **গেছো** ব্যাঙ বলা হয়। গেছো ব্যাঙের আঙ্গুলের

আগায় চক্র থাকে। ব্যাঙের মাথা ও দেহের মধ্যে গলা বলিয়া কিছু নাই। উহাদের কোমরও পৃথক্ করা যায় না। ব্যাঙের সামনের পায়ে প্রায়ই চারটি ও পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙ্গুল থাকে। সামনের পা পিছনের অপেক্ষা দেখিতে অনেক ছোট এবং পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি হাঁসের মত চামড়া দিয়া জোড়া থাকায় ইহারা বেশ সাঁতার দিতে পারে। ইহাদের চোখ দুটি খুব বড় ও
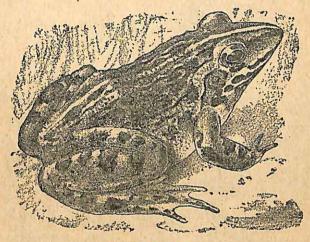
২২। সোনা ব্যাঙ

গোল। ব্যাঙের চোখে তিনপ্রকার পাতা আছে, যথা,—(১) উপরের পাতা, (২) নীচের পাতা ও (৩) আর একপ্রকার পাতা যাহা আমাদের নাই। এই পাতা উপর ও নীচের পাতা অপেক্ষা পাতলা। কান দুইটি পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে বলিয়া ব্যাঙ অক্লেশে জলের মধ্যে চলাচল করিতে পারে।

ব্যাঙের রূপান্তর—গরমের শেষে ব্যাঙ সাধারণতঃ সামান্য জলে ডিম পাড়ে। বর্ষার সময়ে পুকুরের ধারে ও নদী নালার পাশে

জমাট গঁদের মত একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে সকল কাল কাল দানা থাকে তাহাই সোনা ব্যাঙের ডিম। কুনো ব্যাঙ মটরের মালার মত **ডিম** পাড়ে। প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করিয়া ডিম থাকে। ডিমের খোলা খুব নরম ও পাতলা হয়। সোনা ব্যাঙের ডিম দেখিতে কাল কিন্তু কুনো ব্যাঙের ডিমের

২৩। কুনো ব্যাঙ

মত কাল নহে। ডিমগুলি জল পাওয়াতে ফুলিয়া উঠে ও ক্রমশঃ লম্বা হয়। ইহারাই পরে ব্যাঙের বাচ্চা বা **ব্যাঙাচিতে** পরিণত হয় (২৪নং চিত্র)। ডিম পাড়িবার পনের দিন পর পর্য্যন্ত ব্যাঙাচিদের কিছুই খাইতে হয় না ; এমন কি এই সময় তাহাদের মুখও খোলে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ইহাদের ফুল্‌কাও থাকে না। কয়েক দিন পরে উহাদের মুখ দেখা যায় ও তাহার চারি পাশে দাঁতের মত বাহির হয়।

এই সময়ে উহারা জলের মধ্যে যেসকল মরা জীবজন্তু পায় তাহাদের মাংসের রস খাইয়া বড় হয়। ক্রমে মুখের ছিদ্রের উভয় পার্শ্বে ফুল্‌কা বাহির হয়। ফুল্‌কা প্রথমে বাহির হইতে দেখা যায়; কিছুদিন পরে তাহার উপর কান্‌কো চাপা পড়ে। দেহ ও লেজ যেখানে মিশিয়াছে তাহার কাছে তুইটি গুটির মত জন্মে। ইহা হইতেই ব্যাঙের পিছনের
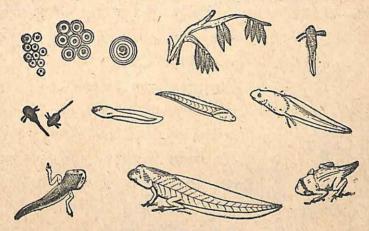
২৪। ব্যাঙের ডিম, ব্যাঙাচি ও ব্যাঙ

পা জন্মিয়া থাকে। পিছনের পা বাহির হইবার পূর্ব্বেই ব্যাঙাচিদের সামনের পা বাহির হয় (২৪নং চিত্র)। ক্রমে ব্যাঙাচি কতকটা ব্যাঙের সম্পূর্ণ আকার পায়; কেবল তাহাদের লেজটি থাকে (২৪নং চিত্র)। দেহটি যতই পুষ্ট হইতে থাকে লেজটি ততই আকারে ছোট হয়। লেজটি এইরূপে অল্প অল্প ক্ষয় হইয়া দেহকে পুষ্ট করে। টিকটিকির লেজের মত উহার লেজ খসিয়া যায় না।

প্রশ্ন

১। সোনা ও কুনো ব্যাঙ দেখিতে কিরূপ?

২। ব্যাঙের রূপান্তরের বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মানবদেহের সাধারণ পাঠ

মানুষের দেহের অংশ—মানুষের দেহে তিনটি অংশ আছে, যথা,—মাথা, দেহ বা ধড় এবং হাত-পা প্রভৃতি অবয়ব। এই অংশগুলি আবার হাড়, মাংসপেশী, ত্বক্ প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত।

২৫। নরকঙ্কাল

মানুষের হাড়—মানুষের দেহের হাড় নানা খণ্ডে বিভক্ত। এগুলি যদি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত না হইয়া একটি মাত্র হাড় হইত তাহা হইলে আমরা দাঁড়াইতে, বসিতে, শুইতে অথবা চলাফেরা করিতে পারিতাম না। মানুষের দেহে মোট ২০৬ খানি হাড় আছে; ইহাদের সমষ্টিকে **কঙ্কাল** বলে। কঙ্কালই আমাদের দেহের কাঠামো যাহার উপর মাংসপেশী ও অন্যান্য তন্তু মিলিয়া দেহের বাহিরের অংশ তৈয়ার করে।

দেহ-কোষ ও দেহ-তন্তু—প্রাণী মাত্রেরই দেহ কোষের দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষে প্রটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জীবিত বস্তু থাকে। কতকগুলি কোষের দ্বারা নানা-

প্রকার তন্তু তৈয়ারী হয়; এই তন্তু দিয়াই দেহের নানাবিধ যন্ত্র গঠিত। তন্তু চার প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার তন্তুর নাম হইল
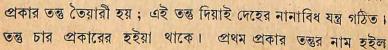
চাম তন্তু অর্থাৎ যাহার দ্বারা দেহ ঢাকা থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের নাম **জোড় তন্তু** অর্থাৎ যাহা দিয়া জোড়া হয়, যেমন, চর্ব্বি, হাড়, রক্ত, দাঁত প্রভৃতি। যদিও আপাতদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয় তথাপি সবগুলিই জোড় তন্তুর অন্তর্গত, কারণ এই সকল তন্তু একভাবে তৈয়ারী হয়। তৃতীয় প্রকার তন্তুকে **পেশী তন্তু** বলে ; ইহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে। চতুর্থ প্রকার তন্তুকে **বার্ত্তাবহ তন্তু** বলা হয় ; ইহাদের জন্য মগজ অন্য স্থানের খবর পায়।

শ্বেত রক্ত কণিকা

লোহিত রক্ত কণিকা

২৬। রক্ত

রক্ত সঞ্চালন—রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের তরল পদার্থ। রক্তে তিন প্রকার দ্রব্য থাকে, যথা,—তরল পদার্থ বা **রক্তরস** এবং কঠিন পদার্থ, **লাল কণিকা** ও **সাদা** কণিকা (২৬নং চিত্র)। লাল কণিকা দেখিতে গোলাকার ও উহার মধ্যভাগ দুই পাশ হইতে চেপ্টা। হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থের জন্য লাল কণিকার বর্ণ লাল। এই হিমোগ্লোবিনই অক্সিজেন গ্যাস লইতে পারে ও সেই অক্সিজেন শরীরের নানা স্থানে রক্তের প্রবাহের সহিত যাইয়া দেহের সকল স্থানের কোষে

সরবরাহ হয়। রক্ত যখন ফুসফুসে যায় তখন লাল কণিকার হিমোগ্লোবিন বাতাস হইতে অক্সিজেন লয় ও ফুসফুসে আসিবার সময় শরীরের নানাস্থান হইতে দূষিত পদার্থ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ফুসফুসে আনিয়া পরিত্যাগ করে। সাদা কণিকার আকার নানাপ্রকার ও উহারা সংখ্যায় কম। প্রতি ৬০০ লাল কণিকায় একটি করিয়া সাদা কণিকা থাকে এবং উহা আমাদের দেহকে জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। দেহে কোন রোগ হইলে উহারা জীবাণুদের মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে; সফল না হইলে উহারা নিজেরাই মারা পড়ে। ফোড়ার মধ্যে যে পুঁজ দেখা দেয় তাহার কতক অংশ হইল এই সাদা কণিকার মৃতদেহ।

রক্ত ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্যাস লইয়া উহাকে দেহের সকল কোষে সরবরাহ করে। উহা আবার খাদ্যের সারাংশ অন্ত্র হইতে সংগ্রহ করে এবং উহাকে দেহের নানা অংশের কোষে সরবরাহ করিয়া তাহাদের পুষ্ট করে। রক্ত দেহের সকল স্থানের কোষ হইতে দূষিত পদার্থ ফুসফুসে, কিডনীতে ও চামে লইয়া গিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়।

রক্তবহা নালী—যে সকল নালী দিয়া রক্ত চলাচল করে তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকারের, যথা—**ধমনী, শিরা** ও **জাল-নালী**। ধমনীর ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ রক্ত দেহের সকল স্থানে যায়। **শিরা** দূষিত রক্তকে দেহের নানাস্থান হইতে বহিয়া ফুসফুসে লইয়া যায় ও উহাকে বিশুদ্ধ করে। কোষের নিকটে রক্ত লইয়া যাইবার মত ধমনী বা সেখান হইতে রক্ত ফেরত লইবার মত শিরা অত সরু হইতে পারে না বলিয়া এই দুইপ্রকার নালীর মধ্যে **জাল-নালী** থাকে। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া দেহ-কোষে যাতায়াত করে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে দেহের সর্ব্বত্র রক্ত বহে ও দেহের সকল স্থান হইতে রক্ত ফিরিয়া আসে তাহাকেই **হৃদয়** কহে। হৃদয় ফুসফুস দুইটির মধ্যে অবস্থিত এবং আকারে অনেকটা নোনার মত। ইহার ভিতর ফাঁপা এবং উপরে একটা পাতলা আবরণ থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হৃদয়ের স্পন্দন চলে। ইহা হৃদয়ের সঙ্কোচন, প্রসারণ ও বিরামের ফলে সাধারণতঃ মিনিটে ৭২ বার হইয়া থাকে।

শ্বাসকার্য্য——শ্বাসকার্য্যের সময় অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ হইয়া থাকে। প্রাণধারণ করিতে এই অক্সিজেন গ্যাস বিশেষ প্রয়োজন। শ্বাসের জন্য নাকের দুইটি ছিদ্র দিয়া বায়ু শ্বাসনালী-পথে ফুসফুসে যায়। বায়ু ফুসফুসে আসিলে রক্তের হিমোগ্লোবিন বায়ুর অক্সিজেন শোষণ করে ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। এই সময়ে দেহের মধ্যে দহনকার্য্য চলে এবং তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—দেহের মধ্যে এক প্রকাণ্ড নালীতে খাদ্য হজম হয়। ইহা মুখবিবর হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে **পৌষ্টিক** নালী কহে। ইহার প্রথমাংশকে **মুখবিবর** বলে। বিবরের সামনে দাঁত থাকে। পূর্ণবয়সে দুইটি পাটিতে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। দাঁত চারি প্রকারের, যেমন, **চর্ব্বণ** বা চিবাইবার **দাঁত, কর্ত্তন** বা কাটিবার **দাঁত, ছেদন** বা ছিঁড়িবার **দাঁত** ও **পোষণ** বা পিষিবার **দাঁত**। জিহ্বা নানাপ্রকারে নড়াচড়া করিয়া খাদ্য চিবাইতে দাঁতকে সাহায্য করে। এই খাদ্য মুখবিবর হইতে অন্ননালী (ইসোফেগস) দিয়া আমাশয়ে যায় ও পরে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়া বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করে। পৌষ্টিকনালীর ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে আমাশয়, যকৃতের পিত্তথলী, অগ্ন্যাশয় ও অন্ত্র হইতে নানারূপ জারকরস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যকে হজম করে। হজমের

পরে খাদ্যের তরল সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। খাদ্যাংশের জলীয়

২৭। পৌষ্টিক নালী

ভাগ বৃহৎ অন্ত্র শোষণ করে এবং অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে তাহা মলরূপে পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রশ্ন

১। মানবদেহে কতগুলি হাড আছে? খণ্ড খণ্ড হাড়ের প্রয়োজন কি?
২। তন্তু কয় প্রকার? উহার কাজ কি?
৩। রক্তের উপাদান কি? কি উপায়ে উহা দেহের সর্ব্বত্র চলাচল করে?
৪। শ্বাসকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা কি?
৫। পৌষ্টিকনালী কাহাকে কহে? উহার আবশ্যকতা কি?

নবম অধ্যায়

আকাশ পর্য্যবেক্ষণ

মেঘ—বৃষ্টি—শিশির

বিভিন্ন প্রকারের মেঘ—আকাশের দিকে তাকাইলে নানা-রকমের মেঘ চোখে পড়ে। ভূমি হইতে পাঁচ বা সাত মাইল উপরে এক রকম পালকের মত ছোট ছোট সাদা মেঘ দেখা যায়। ইহাকে **অলকমেঘ** বলে (২৮নং চিত্র, ক)। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে এইগুলি তুষারকণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দিগন্ত হইতে কিছু উপরে আকাশের গায়ে রাশি রাশি গোলাকার তূলার মত সাদা মেঘ জমা হয়। ইহাকে **তূলামেঘ** বলে (২৮নং চিত্র, গ)। তূলামেঘ দেখা দিলে ঝড়-বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকালের দিকে ইহাদের সৃষ্টি হয় এবং সন্ধ্যার সময় ইহাদের দেখা যায় না। কাল-বৈশাখীর সময়ে আকাশে আর এক রকমের মেঘ দেখা যায়। ইহারা গাঢ় ধূসর রংয়ের হয় ও ঝালরের মত কিনারা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ভূমি হইতে ইহারা সাধারণতঃ এক মাইলের মধ্যেই থাকে। ইহাদের **নীরদমেঘ** বলে (২৮নং চিত্র, ঘ)। এই মেঘ হইতেই ঝড়, বজ্র ও বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং বৃষ্টি পড়ে। সাধারণতঃ শরৎকালে দিগন্তের সমান্তরালভাবে আর এক রকম মেঘ কখনও কখনও স্তরে স্তরে জমা হইতে দেখা যায়। ইহাকে **স্তরমেঘ** বলে (২৮নং চিত্র, খ)। নির্ম্মল আকাশে ঠিক সূর্য্যাস্তের পর এই রকম মেঘ দেখা যায়। সূর্য্যোদয়ের সময় ইহাদের দেখা যায় না। স্তরমেঘে বৃষ্টি হয় না।

মেঘ ও বৃষ্টির কারণ—সমুদ্র, নদ-নদী, পুকুর প্রভৃতির জলে সূর্য্যকিরণ পড়িলে উহার উত্তাপে অথবা গরম বায়ুর স্পর্শে জল

২৮। মেঘ : অলক মেঘ (ক), তূলা মেঘ (গ), নীরদ মেঘ (ঘ) ও স্তর মেঘ (খ)

ক্রমাগত বাষ্প হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। বাতাসে সকল সময়েই কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। বাতাস ঠাণ্ডা হইলে ছোট ছোট

বাষ্পকণা একত্র মিলিয়া অসংখ্য বড় জলকণার সৃষ্টি করে এবং এই জলকণাই মেঘ ও বৃষ্টিরূপে দেখা যায়।

বায়ু নির্দ্দিষ্ট তাপে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে। তাপ বাড়িলে উহার জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার শক্তিও বাড়ে। নির্দ্দিষ্ট তাপে বায়ুতে যতখানি জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে তাহা পূর্ণ হইলে বায়ু আর জলীয় বাষ্প লইতে পারে না। জলীয় বাষ্প সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা; সেই কারণে উহা সহজেই উপরের দিকে উঠিয়া যায়। উপরের বায়ুস্তর ঠাণ্ডা ও সেখানে বায়ুমণ্ডলের চাপও কম। জলীয় বাষ্পসমেত বায়ু এই স্তরে আসিলে সহজে বিস্তারিত ও ঠাণ্ডা হয়। তখন ঐ তাপে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হয় বলিয়া বায়ু আর উহা ধরিয়া রাখিতে পারে না; উহার কিছু অংশ বায়ু হইতে আলাদা হইয়া পড়ে এবং বায়ুমণ্ডলে ভাসমান এক একটি ধূলার কণাকে লইয়া অতি ছোট জলকণার আকারে বাতাসে ভাসিতে থাকে। এইরূপ অসংখ্য ভাসমান জলকণাই পৃথিবীর উপরে মেঘরূপে দেখা যায়। মেঘ আরও ঠাণ্ডা হইলে জলকণাগুলি মিলিয়া বড় জলকণার সৃষ্টি করে এবং জলবিন্দুর আকারে ভূপৃষ্ঠে পড়িতে থাকে। অনেক সময় আকাশে মেঘ জমিতে থাকিলেও বৃষ্টি পড়ে না। মেঘ কোনও কারণে গরম হইলে বা হঠাৎ গরম হাওয়া বহিলে জলকণাগুলি আবার বাষ্পে পরিণত হয় এবং মেঘ আকাশে মিলাইয়া যায়।

শিশির—রাত্রিকালে মাটি ঠাণ্ডা হইলে তাহার স্পর্শে আসিয়া বায়ুস্তরও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ফলে বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা ও ঘন হইয়া গাছের পাতা ও ঘাসের উপর জলবিন্দুর আকারে দেখা যায়। ইহাকেই শিশির বলে। একটি পাত্রে বরফ রাখিলে দেখা যায় যে

পাত্রটি ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে বাহিরের বাতাসের জলীয় বাষ্প উহার স্পর্শে আসিয়া পাত্রের গায়ে জলকণার সৃষ্টি করে। শিশরও ঠিক এই প্রকারেই তৈয়ারী হয়। এদেশে হেমন্ত ও শীতকালে প্রচুর শিশির পড়ে।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন প্রকার মেঘের বিবরণ দাও।
২। মেঘ ও বৃষ্টির কারণ কি ?
৩। বৃষ্টি ও শিশিরের তুলনা কর।

সূর্য্য

দিনের বেলায় সূর্য্য, রাত্রিকালে চন্দ্র এবং মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশের গায়ে লক্ষ লক্ষ আলোকবিন্দুকে মিটমিট করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। আলোকবিন্দু সমেত এই অর্দ্ধ-গোলাকার স্থানের নাম **আকাশমণ্ডল**। আলোকবিন্দুগুলি পরস্পর হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আছে এবং দূরে থাকে বলিয়াই উহাদিগকে আকাশের গায়ে বসান বলিয়া মনে হয় ; প্রকৃতপক্ষে উহারা শূন্যে অবস্থিত। দিনের বেলায় সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে উহাদের দেখা যায় না। সূর্য্য, চন্দ্র ও এই আলোকবিন্দুগুলির সাধারণ নাম **জ্যোতিষ্ক**। কতকগুলি জ্যোতিষ্কের নিজের জ্যোতিঃ বা আলো আছে, অপরগুলির নিজেদের কোনও জ্যোতিঃ নাই। উহারা অন্যের অলোকে আলোকিত হয় বলিয়া উহাদের উজ্জ্বল দেখায়। উহাদের মধ্যে যেগুলি সংখ্যায় অগণিত, আকাশে স্থির থাকে, নিজেদের আলোকে মিটমিট করিয়া জ্বলে এবং পৃথিবী হইতে বহুদূরে আছে, তাহাদের নক্ষত্র বলা হয়। অল্প কয়েকটি জ্যোতিষ্ক আছে যাহাদের নিজেদের কোনও আলো নাই,

সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় বলিয়া উজ্জল দেখায়, যাহারা স্থিরভাবে আলো দেয়, নক্ষত্রের তুলনায় যাহারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আছে এবং যাহারা আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে গ্রহ বলে। ইহা ছাড়া উপগ্রহ, ধূমকেতু, নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি আরও নানারকমের জ্যোতিষ্ক দেখা যায়।

সূর্য্য আমাদের অতি পরিচিত জ্যোতিষ্ক। ইহার নিজের জ্যোতিঃ আছে। সেই হিসাবে ইহা একটি নক্ষত্র এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। ইহা আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবীর নিকটে আছে বলিয়া উহাকে অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা বড় দেখায়। পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব বড় কম নয়, প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

সূর্য্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। উহার ও পৃথিবীর দেহের মূল পদার্থগুলি একই প্রকার। প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য সূর্য্যদেহের মূল পদার্থগুলি কঠিন বা তরল অবস্থায় না থাকিলেও ঠিক গ্যাসীয় অবস্থায় নাই। পৃথিবী যেমন নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ পৃথিবীর সওয়া সাতাশ দিনে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া থাকে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে সূর্য্য গোলাকার।

সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং আকাশপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। ইহাতে মনে হয় যেন পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হইয়া আছে এবং সূর্য উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হইয়া নাই এবং সূর্য্যও উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কোপারনিকাসই এই মত প্রথম প্রচার করেন।

সূর্য্যদেহের যে উজ্জ্বল আবরণ হইতে আলোক বাহির হয় তাহাকে **আলোকমণ্ডল** বলে। এই মণ্ডলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে কতকগুলি কাল কাল দাগ বা **সূর্য্যকলঙ্ক** দেখা যায়। ইহার বাহিরে **বর্ণমণ্ডল, ছটামণ্ডল** প্রভৃতি আরও কয়েকটি মণ্ডল আছে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে

২৯। সূর্য্য
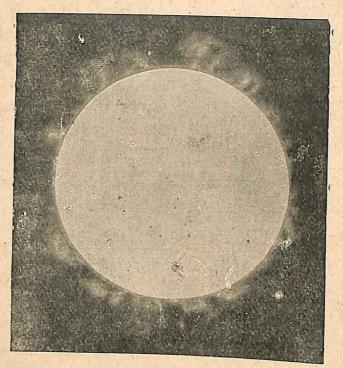
গ্যাসীয় মণ্ডল অবিরত জ্বলিতেছে, বর্ণমণ্ডল সেই আগুনেরই শিখা। এক একটি শিখা আলোকমণ্ডল হইতে সাধারণতঃ হাজার হাজার মাইল উপরে উঠে। সূর্য্যগ্রহণের সময় যে তীব্র আলোকের ছটা বাহির হয় তাহাকে **ছটামণ্ডল** বলে।

সূর্য্য আমাদের সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যে সকল শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহা সূর্য্যশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। দিনে সূর্য্যের কিরণ আমরা পাইয়া থাকি এবং উহার আলোকে সব কিছু দেখিতে পাই। সূর্য্যের জন্যই চন্দ্র এবং গ্রহগণকে দেখা যায় এবং পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সূর্য্যেরই প্রচণ্ড শক্তির কণামাত্র কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতির মধ্যে জমা আছে। এই শক্তির জন্যই এঞ্জিন চলা, সাত সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, আকাশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছে। সবুজ উদ্ভিদ্ সূর্য্যকিরণের সাহায্যেই নিজেদের ও প্রাণিজগতের খাদ্য প্রস্তত করিয়া থাকে। সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ আকাশপথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। যে সূর্য্য এত শক্তির আধার, যখন উহারও শক্তি শেষ হইয়া যাইবে তখন পৃথিবীতে অথবা অন্য কোনও গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আর সম্ভব হইবে না।

প্রশ্ন

১। জ্যোতিষ্ক কাহাকে বলে? কত রকমের জ্যোতিষ্ক আছে? গ্রহ ও নক্ষত্রের তুলনা কর।

২। সূর্য্য সম্বন্ধে কি জান? সূর্য্য-কলঙ্ক কাহাকে বলে? সূর্য্য আমাদের কি করে?

চন্দ্র ও চন্দ্রের কলা—চন্দ্রের কার্য্য

চন্দ্র—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের গ্রহ এবং যাহারা গ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে তাহাদের উপগ্রহ বলে। চন্দ্র এইরূপ একটি উপগ্রহ। উহা আমাদের

পৃথিবীর চারিদিকে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে একবার ঘুরিয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্বলন্ত অবস্থায় নাই ; উহা কঠিন ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। উহার নিজের কোনও আলো নাই ; সূর্য্যের আলো উহার উপর পড়ে বলিয়া চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্র দেখিতে গোল এবং পৃথিবীর তুলনায় আকারে অনেক ছোট, $\frac{১}{৪৯}$ ভাগ মাত্র। উহা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে ; দূরত্ব দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। পৃথিবীর কাছে আছে বলিয়া উহাকে বড় দেখায়। পৃথিবীর মত চন্দ্র নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ২৯$\frac{১}{২}$ দিনে একবার ঘুরিয়া থাকে এবং ঘুরিবার কালে উহার এক-দিক সব সময়েই পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে। চন্দ্রের গায়ে যে সকল কাল কাল দাগ দেখা যায় সেগুলিকে **চাঁদের কলঙ্ক** বলে। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই কলঙ্কগুলিকে শুষ্ক সমুদ্রগর্ভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রের উপরিভাগ অসমতল দেখায়। ইহাতে অনেকগুলি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে। কোন কোন আগ্নেয়গিরির গহ্বর আকারে বেশ বড়। চন্দ্রের পাহাড়গুলির উচ্চতা খুব বেশি। ইহাতে মেঘ, বাতাস, জল, কিছুই নাই। সেইজন্য জল-বাতাসহীন অত্যন্ত ঠাণ্ডা চন্দ্রে কোনওরূপ জীবের বাস সম্ভব নয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন।

৩৭। চন্দ্র

চন্দ্রের কলা—চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকে সেইদিকে সূর্য্যের আলো পড়ে, উহার অপরদিক অন্ধকার। ঐ আলোকিত অংশটুকুও পৃথিবী হইতে সকল সময়ে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না। ইহাতে মনে হয় যেন চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির সময়ে চন্দ্রের যতটুকু আলোকিত অংশ দেখা যায় তাহাকে **চন্দ্রের কলা**
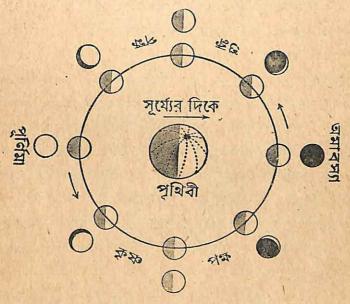
৩১। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি

বলে। অমাবস্যার রাত্রিতে আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। ইহার পর দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রকে আকাশের পশ্চিমদিকে একটি সরু কাস্তের মত দেখায়। অমাবস্যার পর পনের দিন ধরিয়া চন্দ্রের আলোকিত অংশ ক্রমশঃ বাড়িয়া পূর্ণিমা রাত্রে ইহাকে সম্পূর্ণ গোল দেখায়। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কে শুক্লপক্ষ

বলে। পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আবার একটু একটু করিয়া চন্দ্রের আলোকিত অংশের ক্ষয় হইতে থাকে এবং অমাবস্যার রাত্রিতে উহাকে আর দেখা যায় না। চন্দ্র যে সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে সেই সময়ে পৃথিবীও নিজের কক্ষে কতকটা আগাইয়া যায়। এই পথটুকু ধরিতে চন্দ্রের আরও সওয়া দুই দিন সময় লাগে অর্থাৎ এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হইতে অপর পূর্ণিমা বা অমাবস্যার তফাৎ হইল সাড়ে উনত্রিশ দিন।

চন্দ্রের কার্য্য—চন্দ্রের জন্য রাত্রিতে আমরা আলো পাইয়া থাকি। চন্দ্র না থাকিলে প্রত্যহই রাত্রিতে অমাবস্যার মত অন্ধকার হইত। চন্দ্রের আকর্ষণের জন্যই পৃথিবীর উপর জোয়ার-ভাঁটা হইয়া থাকে অর্থাৎ সমুদ্র বা নদীর জল এক জায়গায় ফুলিয়া উঠে এবং অন্যস্থানে নামিয়া যায়। জায়গা বিশেষে জলের এইরূপ ফুলিয়া উঠাকে জোয়ার এবং নামিয়া যাওয়াকে ভাঁটা বলে। অমাবস্যায় চন্দ্রের আকর্ষণের সঙ্গে সূর্য্যের আকর্ষণ মিলিলে জোয়ার আরও প্রবলভাবে দেখা দেয়, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে আছে বলিয়া উহার আকর্ষণই অধিকতর প্রবল।

প্রশ্ন

১। চন্দ্র কি প্রকারে আলো পায়? চন্দ্রের কলঙ্ক বলিতে কি বুঝি?
২। চন্দ্রের বিষয় কি জান লিখ।
৩। চন্দ্রকলা কাহাকে বলে?

ধ্রুবতারা—সপ্তর্ষিমণ্ডল—ক্যাসিওপিয়া—কালপুরুষ—সন্ধ্যাতারা—ছায়াপথ

অন্ধকার রাত্রে অগণিত নক্ষত্রকে আকাশের গায়ে মিটমিট করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। ইহাদের অনেকেই আকারে সূর্য্য হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় ও তেজোময়। বহুদূরে আছে বলিয়া নক্ষত্রগুলিকে ছোট ছোট আলোকবিন্দু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে উহাদের দেখা যায় না। উহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব হইল কোটি কোটি মাইল। দূরবীক্ষণের সাহায্যেও উহাদের বড় দেখায় না। নক্ষত্রদের মধ্যে কতকগুলিকে একজায়গায় সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থার দেখা যায়। ইহারা **নক্ষত্রপুঞ্জ** বা **নক্ষত্রমণ্ডল** নামে পরিচিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ এক একটি মণ্ডলের নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করিয়া মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন ও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া, কালপুরুষ প্রভৃতি এইরূপ নক্ষত্রমণ্ডলের উদাহরণ।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—ইহা দেখিতে অনেকটা লাঙ্গলের মত (৩২নং চিত্র) এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে আকাশের উত্তর দিকে দেখা যায়। ইহাতে সাতটি নক্ষত্র আছে।

ধ্রুবতারা—সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ দুইটি নক্ষত্রকে (৩২নং চিত্র) একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করিয়া উহার গোলাকার কেন্দ্রের দিকে টানিয়া দিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি পাওয়া যায় তাহার নাম ধ্রুবতারা। উহা পৃথিবীর উত্তর মেরুর ঠিক উর্দ্ধে স্থিরভাবে থাকে এবং সারাবৎসর উহাকে একই জায়গায় দেখা যায়। উত্তর আকাশে

সকল নক্ষত্রই এই ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া থাকে। নক্ষত্রেরা প্রকৃতপক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায় না ; পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্যই উহারা
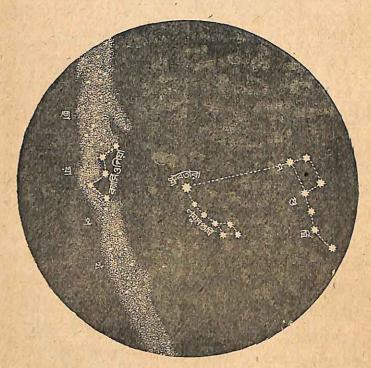
৩২। ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া ও ছায়াপথ। পৃথিবীর উত্তর মেরুর উপর হইতে আকাশের ঠিক মাঝখানে ধ্রুবতারাকে দেখা যাইবে।

ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। ধ্রুবতারা দেখিয়া পূর্ব্বে নাবিকেরা সমুদ্রের মাঝখানে দিক্ নির্ণয় করিত। ধ্রুবনক্ষত্র ও উহার নিকটবর্ত্তী আরও ছয়টি নক্ষত্র লইয়া **লঘুসপ্তর্ষিমণ্ডল** (৩২নং চিত্র)। ধ্রুবনক্ষত্রই ইহাদের মধ্যে প্রধান।

ক্যাসিওপিয়া—ধ্রুবনক্ষত্রের যে দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা যায় তাহার বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া অবস্থিত (৩২নং চিত্র)। এই নক্ষত্রমণ্ডলে পাঁচটি নক্ষত্র আছে। এইগুলিকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করিলে অনেকটা ইংরাজি অক্ষর M বা W এর মত দেখায়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যায় যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা যায় না তখন ইহাকে ধ্রুবতারার কাছে উর্দ্ধে দেখা যায়।

৩৩। কালপুরুষ

কালপুরুষ—ইহাকে পূর্ব্বাকাশে পৌষ-মাঘ মাসে দেখা যায় (৩৩নং চিত্র)। ইহার নক্ষত্রগুলিকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করিলে একটি মানুষের আকারের আভাস পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটির কোমরে কোমরবন্ধ ও তাহাতে একটি ছোট তরবারি ঝুলিতেছে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাতারা—প্রতি বৎসর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছু পরে পশ্চিম আকাশে দেখা যায় তাহার নাম **সন্ধ্যাতারা**। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'তারা' বা 'নক্ষত্র' নহে। ইহার নাম **শুক্রগ্রহ,** আমাদের সৌরজগতের অধিবাসী। নক্ষত্রের মত ইহা এক জায়গায় স্থির থাকে না, আকাশপথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যাতারা স্থিরভাবে আলো দেয় এবং ইহার রং ঈষৎ হল্‌দে। পৃথিবীর মত ইহাতে বায়ুমণ্ডল আছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে উহাতে টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘ ভাসিতে দেখা যায়।

ছায়াপথ—অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সাদা মেঘের মত একটি পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম ছায়াপথ (৩২নং ছিত্র)। ইহা প্রকৃতপক্ষে মেঘ নহে, অসংখ্য ছোট ছোট নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র। নক্ষত্রগুলি বহুদূরে থাকায় উহাদের পৃথকভাবে দেখা যায় না এবং সেইজন্য ঐরূপ পথের মত দেখায়। ছায়াপথের আলো বড় কম বলিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে ভাল করিয়া উহাকে দেখা যায় না।

প্রশ্ন

১। নক্ষত্র কাহাকে বলে ? গ্রহ ও নক্ষত্রের তুলনা কর।
২। ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ ও ক্যাসিওপিয়ার বিষয় কি জান ?
৩। সন্ধ্যাতারা কাহাকে কহে ?

দশম অধ্যায়

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ

পৃথিবী যেমন নিজ কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও সেইরূপ আপন কক্ষে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে উহারা এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় যে উহারা পরস্পর একটি সমরেখায় থাকে। তখন কখনও চন্দ্র বা কখনও পৃথিবী সমরেখার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলে কখনও সূর্য্যের সম্মুখে অবস্থিত পৃথিবীর ছায়া পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে এবং কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর কোনও কোনও অংশ হইতে দেখা যায় না। দিনের বেলা কখনও সূর্য্যের সম্মুখে চন্দ্র আসিলে উহার ছায়া

পৃথিবীর কতকাংশে পড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যকে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে রাখে। চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ আচ্ছাদনকে **গ্রহণ** বলা হয়। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য যথাক্রমে একত্র **সমরেখায়** আসিলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে পড়ে এবং **চন্দ্রগ্রহণ** (৩৪নং চিত্র) হইয়া থাকে। পৃথিবীর ছায়া যখন পূর্ণচন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া ফেলে তখন **পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** বলা হয়। চন্দ্র যখন আংশিকভাবে ঢাকা পড়ে
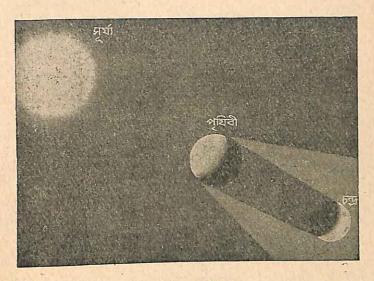
৩৪। চন্দ্রগ্রহণ

তখন তাহাকে **খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** বলে। অমাবস্যা তিথিতে দিনের বেলায় **সূর্য্যগ্রহণ** হইয়া থাকে (৩৫ নং চিত্র)। তখনও পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র **সমরেখায়** অবস্থান করে। ইহাতে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেইস্থান হইতে সূর্য্যকে দেখা যায় না। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ বলা হয়। পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে চন্দ্র থাকায় সূর্য্যকে

কখনও কখনও সম্পূর্ণ দেখা যায় না, আবার কখনও কখনও উহাকে আংশিকভাবে দেখা যায়। সূর্য্য সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া থাকিলে **পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ** এবং আংশিকভাবে ঢাকা পড়িলে **খণ্ডগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ** হইয়া থাকে।
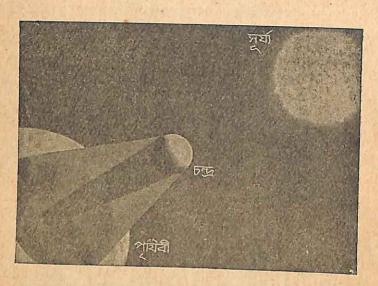
৩৫। সূর্য্যগ্রহণ

প্রতি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় গ্রহণ হয় না। ইহার কারণ হইল চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষপথ এক সমতলে নাই। একটি অপরটির উপর ঈষৎ হেলিয়া আছে এবং পরস্পরকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। চন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে যখন কোনও একটি ছেদবিন্দুর নিকটে পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রে আসিয়া পড়ে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর অথবা চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে ও গ্রহণ হয়। ইহা না হইলে গ্রহণ হইবে না।

প্রশ্ন

১। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ কি ?

২। পূর্ণ ও খণ্ডগ্রাস কাহাকে কহে ?

৩। প্রতি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় গ্রহণ হয় না কেন ?

একাদশ অধ্যায়

আবহাওয়া-চিত্র

কোনও দেশের বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুর উত্তাপ ও চাপের তারতম্য, আর্দ্রতা অর্থাৎ উহাতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং সেইখানে কতখানি বৃষ্টিপাত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের সংবাদকে এক কথায় **আবহাওয়া** বলে। এই আবহাওয়ার উপরেই দেশের চাষ-বাস, গাছ-পালা, জীব-জন্তু ও মানুষের জীবনযাত্রার অনেক কিছু নির্ভর করে। সাধারণতঃ ঋতু-পরিবর্ত্তন ঘটিলে অথবা কোনও জায়গায় বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের কম-বেশি হইলে সেখানকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রত্যহ লক্ষ্য করিয়া এখনকার ও ভবিষ্যতের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

কোনও জায়গায় কতখানি গরম পড়িয়াছে তাহা **থার্ম্মোমিটার** বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। নানাপ্রকার তাপমান যন্ত্রের মধ্যে **ফারেনহাইট থার্ম্মোমিটারই** ইহার জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে (৩৬নং চিত্র, ক)। ইহা একটি সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নলের দ্বারা প্রস্তুত। নলের একদিকে পারদে পূর্ণ একটি ছোট গোলক থাকে। গোলকটি প্রথমে ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে

রাখিলে দেখা যায় যে পারদ ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া নলের অনেকদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়াছে। ঐখানে নলের গায়ে একটি দাগ কাটা
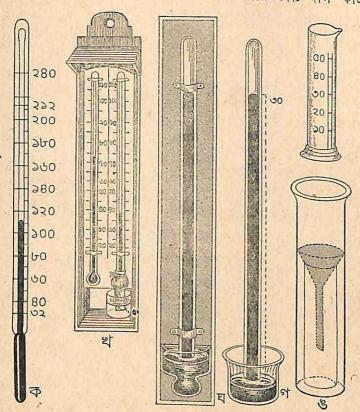
৩৬। আবহাওয়া বিষয়ক যন্ত্রপাতি—থার্ম্মোমিটার (ক), শুষ্ক ও আর্দ্র গোলকবিশিষ্ট থার্ম্মোমিটার (খ), ব্যারোমিটার (গ, ঘ) এবং বৃষ্টিমান যন্ত্র (ঙ)

হয় এবং উহার খোলা মুখটি তাপ লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইবার গোলকটিকে বরফের গুঁড়ার মধ্যে রাখিলে পারদ

ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া নলের মধ্যে আসিয়া স্থির হইলে সেখানেও একটি দাগ কাটা হইয়া থাকে। প্রথমটি ২১২ এবং পরেরটিকে ৩২ ধরিয়া উহাদের মধ্যের স্থানকে ১৮০ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। এই এক একটি ভাগকে ডিগ্রি বলে। নলের মধ্যে পারদের উচ্চতার তারতম্য দেখিয়া উত্তাপের মাত্রা জানা যায়। আর এক রকমের তাপমান যন্ত্র আছে যাহার দ্বারা দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের উষ্ণতা এবং গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বনিম্ন তাপ জানিতে পারা যায়।

শুষ্ক ও আর্দ্র গোলকবিশিষ্ট আর এক রকমের **থার্ম্মোমিটার** (৩৬নং চিত্র, খ) আছে যাহার দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ জানা যায়। ইহার দুইটি থার্ম্মোমিটারের মধ্যে একটির গোলকের গায়ে ভিজা পলিতা লাগাইয়া উহাকে নিম্নে অবস্থিত একটি ছোট পাত্রের জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়। বায়ু শুষ্ক হইলে ভিজা পলিতার জল যতই বাষ্পে পরিণত হয় ততই গোলকটি ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং থার্ম্মোমিটারের পারদ নামিয়া আসে। দুইটি থার্ম্মোমিটারে পারদের দৈর্ঘ্য দেখিয়া বায়ুর আর্দ্রতা স্থির করা হয়। পার্থক্য বেশি হইলে বায়ুর আর্দ্রতা কম বুঝিতে হইবে।

চাপমান যন্ত্র বা **ব্যারোমিটারের** (৩৬নং চিত্র, গ, ঘ) সাহায্যে বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়। একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর একটি এক দিক বন্ধ ৩৬" ইঞ্চি লম্বা কাচের নল পারদে পূর্ণ করিয়া উহার উপর উল্‌টাইয়া রাখিলে দেখা যায় যে নলের মধ্যে পারদটুকু কিছুটা নামিয়া আর নামিতেছে না। পাত্রের পারদের উপরিভাগ হইতে নলের ভিতরে এই পারদের উচ্চতা ৩০" ইঞ্চি। পাত্রের পারদের উপর বায়ুর চাপের জন্যই নলের মধ্যে পারদ দাঁড়াইয়া থাকে, নামিয়া আসে না। এই

৩০″ ইঞ্চি পারদস্তম্ভের ভার সেই জায়গায় বায়ুর চাপের সমান। হিসাব করিয়া স্থির হইয়াছে যে এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় বায়ুর চাপ প্রায় সাড়ে সাত সের। এই চাপ সকল জায়গায় সমান নয়। সমুদ্রতীর হইতে যতই উপরের দিকে যাওয়া যায় ততই চাপ কমিতে থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেক জায়গার বায়ুর স্বাভাবিক চাপ বুঝাইবার জন্য চাপমান যন্ত্রের পারদের একটি নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা আছে। কোনও জায়গায় নির্দ্দিষ্ট উচ্চতার নীচে পারদ নামিলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়াছে অথবা বায়ু উত্তাপে প্রসারিত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বুঝায়।

বৃষ্টিমান যন্ত্রের (৩৬নং চিত্র, ঙ) দ্বারা বৃষ্টির পরিমাণ জানা যায়। যন্ত্রের তিনটি অংশ আছে, যথা—দুইটি নলাকৃতি পাত্র ও একটি ফাঁদল। পাত্র দুইটির মধ্যে একটি বড় ও অপরটি ছোট। বড়টির মধ্যে ছোট পাত্রটি রাখিয়া উহার মুখে একটি ফাঁদল এরূপে লাগান থাকে যে বৃষ্টির জল পড়িলেই তাহা ফাঁদলের মধ্য দিয়া পাত্রের মধ্যে চলিয়া যায়, উহার বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। বৃষ্টির পর পাত্রটিতে যে জল জমে তাহা ইঞ্চিদাগযুক্ত নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ঢালিলে বৃষ্টির পরিমাণ মাপা যায়। ইহার জন্য যে পাত্রটিতে জল জমে তাহার এবং ফাঁদলটির ক্ষেত্রফল জানা প্রয়োজন। উহা হইতে বৃষ্টির পরিমাণ হিসাব করা যায়।

এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিনের বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, এবং আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের ফল লিখিয়া রাখিলে সেই জায়গার আবহাওয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার ফল কিভাবে লিখিতে হয় তাহা পরে দেখান হইল।

স্থানের নাম ঃ—কলিকাতা   সময় ঃ—গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে

তারিখ	উষ্ণতা (ডিগ্রি)			বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	আর্দ্রতা (শতকরা ভাগ)		মন্তব্য
	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	গড়		সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	
২৬শে জুলাই, ১৯৫২	৮১°	৭৮°	৭৯·৫°	০৬·৭″	৯৭	৯৪	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; দু'এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
২৭শে জুলাই, ১৯৫২	৮৩°	৭৭°	৮০°	০·২৮″	৯৭	৮৩	মাঝে মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
২৮শে জুলাই, ১৯৫২	৮৭°	৭৭°	৮২°	০·২৩″	৯২	৭৪	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; মাঝে মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

প্রশ্ন

১। তাপমান যন্ত্র কাহাকে বলে ? ইহা কিরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে ?

২। বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে মাপা যায় ?

৩। চাপমান যন্ত্র কিরূপে তৈয়ার হয় এবং উহা কি কাজে লাগে ?

৪। বৃষ্টিমান যন্ত্রের কথা সংক্ষেপে লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

মাটি ও উহার উপাদান

শিলা বা পাথর হইতে মাটি জন্মে। ইহার বেশির ভাগ পাথরের গুঁড়া ছাড়া আর কিছুই নহে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বায়ু, তাপ, বৃষ্টি, জলপ্রবাহ, জীবাণু প্রভৃতির দ্বারা অথবা অন্যান্য কারণে পাথরের খণ্ডগুলি ধীরে ধীরে গুঁড়া হইয়া ধূলার সৃষ্টি করে। ঐ সকল মাটির কণা কখনও কখনও ঐ স্থানেই থাকিয়া যায় এবং উহার নীচে পাথরের পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। অনেক সময়ে শিলার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলি বৃষ্টির জল, নদীর স্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির দ্বারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইয়া জমা হয়। নদীর চর বা ব-দ্বীপ এই প্রকারে জন্মে। এই প্রকার মাটি খুব উর্ব্বর হয়।

স্থান বিশেষে **মাটির উপাদান** নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাতে কয়েকটি উপাদান থাকে, যেমন—(১) পাথরের গুঁড়া, (২) মৃত জীবজন্তু ও গাছপালার গলিত অংশ, (৩) জীবাণু, (৪) জল ও (৫) বায়ু। পাথরের গুঁড়া হইতে ধাতব পদার্থ অর্থাৎ সিলিকা বা বালি, লৌহ, এলুমিনিয়াম, মেগ্‌নিসিয়াম, সোডিয়াম বা সোডা, পটাসিয়াম বা পটাশ, সালফার বা গন্ধক, ফস্‌ফরাস, কেলসিয়াম বা চুন, ক্লোরিন প্রভৃতিকে বুঝায়। উহারা আলাদাভাবে থাকে না, সাধারণতঃ অক্সিজেনের সহিত নানা অবস্থায় মিলিত থাকে।

সাধারণতঃ যে প্রকার পাথর হইতে মাটি জন্মে, উহার প্রকৃতি ঐ পাথরের মতই হইয়া থাকে। এইজন্য বেলে পাথর হইতে বেলে

মাটি, কর্দ্দম পাথর হইতে কাদামাটি এবং চুনাপাথর হইতে চুনামাটি জন্মে। উপাদানের কম-বেশির উপর মাটির গুণের তফাৎ হইয়া থাকে।

মাটির প্রকারভেদ—মাটি প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইয়া থাকে,—এঁটেল ও বেলে। ইহাদের সংমিশ্রণে আরও কয়েকপ্রকার মাটি দেখা যায়,—যেমন, দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ প্রভৃতি।

যে মাটিতে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বালি, ১০ ভাগের কম কাদা এবং ৫ ভাগের কম চুন থাকে তাহাকে **বেলে মাটি** বলে। নদীর চরের মাটি প্রায় এই প্রকার। অতিরিক্ত বালি থাকার জন্যই এই মাটি আল্‌গা হয় এবং উহাতে জলও দাঁড়ায় না। শীতপ্রধান দেশে বেলে মাটিতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করা যায়। **এঁটেল মাটিতে** শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কাদা থাকে এবং ৫ ভাগের বেশি চুন থাকে না। ইহাতে বালির অংশ কম থাকে। ইহার কণাগুলি স্বভাবতঃই সূক্ষ্ম হয় এবং এই কারণেই ইহার জলধারণের ক্ষমতা অধিক। এই মাটিতে বায়ুর বিশেষ অভাব হইয়া থাকে। **দো-আঁশ** মাটি বেলে ও এঁটেল মাটির সংমিশ্রণে গঠিত। ইহা তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যে মাটিতে কাদা ও বালি সমপরিমাণে থাকে তাহাকে **দো-আঁশ**, যাহাতে বালির অংশ বেশি তাহাকে **বেলে দো-আঁশ**, এবং যাহাতে কাদার অংশ বেশি তাহাকে **এঁটেল দো-আঁশ** বলা হয়। এইপ্রকার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। দো-আঁশ মাটি কৃষিকার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ইহা সহজে কর্ষণ করা যায় এবং ইহার উর্ব্বরতা সহজে নষ্ট হয় না। উপযুক্ত পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা এই মাটির আছে এবং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ইহার বিশেষ ক্ষতি

হয় না। এই মাটিতে প্রায় সকল প্রকার ফসল উৎপন্ন করা যায়। যে মাটি চুনা পাথর হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে **চুনামাটি** বলে। এই মাটিতে শতকরা ২০ ভাগের বেশি চুন থাকে। চুনা মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নানা জাতীয় গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণে যে মাটির উৎপত্তি হয় তাহাকে **উদ্ভিজ্জাত মাটি** বলে। এই মাটিতে চুনের ভাগ প্রায় থাকে না এবং ইহাতে উদ্ভিজ্জাত পদার্থ সকল সময়েই শতকরা ৫ ভাগের বেশি থাকে।

প্রশ্ন

১। মাটি কি প্রকারে তৈয়ার হয়? মাটির উপাদান কি?
২। কত প্রকার মাটি আছে? উহাদের প্রত্যেকটির বিষয় কি জান?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সার ও উহার সাহায্যে মাটির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি; মাটির ক্ষয়

ফসল ফলাইলে জমির উর্ব্বরতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়, কারণ মাটি হইতে খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদ্ শোষণ করিয়া লয়। সেই কারণে ঐগুলি পূরণ করিয়া না দিলে ঐ একই ক্ষেতে আবার ভাল ফসল জন্মাইতে পারা যায় না। যে সকল পদার্থ দ্বারা জমির মধ্যকার খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে তাহাকেই সার বলে। সার সাধারণতঃ দুইপ্রকারের হইয়া থাকে,— সাধারণ সার ও বিশেষ সার। 'সাধারণ সার' জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্

হইতে পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বা ভস্ম এবং বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উপযুক্ত মাত্রায় জমিতে ব্যবহার করিলে উহার উৎপাদনশক্তি বাড়ে। তখন সেই সারকে 'বিশেষ সার' বলে।

গোবর সার—গোময় সহজলভ্য গৃহজাত সার। ইহাতে সারাংশ বেশি নাই বলিয়া ইহা জমিতে অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। গোবর সার চৌবাচ্চাতে প্রস্তুত করিতে হয় এবং বীজ বপনের কিছু পূর্ব্বে জমিতে দিয়া লাঙল দিতে হয়। বীজ বপনের তিনমাস পূর্ব্বে কাঁচা গোবরও জমিতে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু উহা ভাল করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে। কাঁচা গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ আসিয়া গাছগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। বেলে ও এঁটেল মাটিতে গোবর সার প্রয়োগ করিলে উহা চাষের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠে।

অন্যান্য পশু-পক্ষী প্রভৃতির বিষ্ঠা বা মল—ঘোড়া, ছাগল, মেষ, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতির বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অশ্ব-বিষ্ঠা গোময় হইতেও তেজস্কর, যদিও ইহা সকল স্থানে পাওয়া যায় না। ছাগল ও মেষের বিষ্ঠা গোবর ও ঘোড়ার বিষ্ঠা হইতেও শক্তিশালী। পক্ষিবিষ্ঠা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। বিষ্ঠাশ্রেণীর সারের মধ্যে পতঙ্গ-বিষ্ঠাই সবচেয়ে ভাল, কিন্তু উহা সহজে পাওয়া যায় না। মানুষের বিষ্ঠাও ভাল সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু এদেশের কৃষকগণ উহা ব্যবহার করিতে চাহে না। অন্যান্য দেশে ইহার প্রচলন আছে। বড় বড় চৌবাচ্চার মত গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে তরল বিষ্ঠার সহিত মাটি মিশাইয়া শুকান হয়। তখন ইহাতে অতি সামান্যই গন্ধ থাকে। এই অবস্থায় ইহাকে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মানুষের বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহার করা হয়।

গোমূত্র—গোমূত্র গোবর হইতে বেশি সারবান। অনভিজ্ঞ কৃষকগণ এদেশে গোমূত্রকে সাররূপে ব্যবহার করে না। গোশালা হইতে গোমূত্র সংগ্রহ করিয়া উহা ২০ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া ক্ষেতে দিলে উহার উর্ব্বরতা বাড়ে।

পচা পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্-সার—পচা পাতা, ডাল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি বড় গর্ত্তের মধ্যে গাছের পাতা, ডাল প্রভৃতি এক বৎসর ফেলিয়া রাখিলে উহা পচিয়া সার হয়। তখন গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া উহাকে জমিতে দেওয়া চলে। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে উদ্ভিদ্সার দেওয়া উচিত নয় কারণ ঐ সারের মধ্যে একপ্রকার পোকা থাকে যাহার দ্বারা চারাগাছের শিকড়গুলির ক্ষতি হইতে পারে। পচা কচুরীপানার পাতা হইতে উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া তিল, সরিষা, মসিনা, রেড়ি, চীনাবাদাম, কার্পাস-তূলার বীজ প্রভৃতি হইতে যে খোল হয় তাহা সাধারণ সারের মধ্যে একটি প্রধান সার। বীজ বপনের কিছু পূর্ব্বে খোল চূর্ণ করিয়া জমির উপরে দিতে হয়। ধইঞ্চা, শন প্রভৃতি শস্য বাতাস হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে; এইজন্য ঐ জাতীয় গাছ ছোট ও সবুজ অবস্থায় মাটির সহিত লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মিশাইয়া দিলে উহাতে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে। এই প্রকার সারকে 'সবুজ সার' বলা হয়।

জমিতে কোন্ জিনিসের অভাব হইয়াছে অথবা গাছের কোন্ লবণের দরকার এইসব বিবেচনা করিয়া সার ঠিক করিতে হইবে। প্রয়োজনের বেশি সার জমিতে দিলে উহাতে গাছের অনিষ্ট হয়; এমন কি, শস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

মাটির ক্ষয়—সাধারণতঃ অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে যেসকল জমি ভাসিয়া যায় সেসকল স্থানের মাটির উপরিভাগের সারাংশ ধুইয়া মাটি বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা জলের স্রোতে বহুদূরে চলিয়া যায়। ইহাকে মাটির-ক্ষয় বলে। প্রথম হইতে ঐ সকল জমির চারিদিকে আল বাঁধিয়া জলের কিছু অংশ ধরিয়া রাখিতে পারিলে মাটির ক্ষয় কিছুটা বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ঐ জলমিশ্রিত পলি জমির উপর পড়িয়া মাটিকে কতক পরিমাণে দো-আঁশ করিয়া দেয়। কোনও উর্ব্বর জমিতে একই শস্য প্রতি বৎসর চাষ করিলে মাটির উপাদানগুলি অতিরিক্ত ভাবে ব্যয় হওয়ার জন্য উহা ক্রমশঃ অনুর্ব্বর বা চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, কারণ উদ্ভিদ্ উহার পুষ্টির জন্য কয়েকটি বিশেষ লবণ শিকড়ের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লয়। ইহাতেও মাটির ক্ষয় হয়। মাটির এই ক্ষয় বন্ধ করিতে হইলে একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শস্যের চাষ করিতে হয়। উহাতে মাটির মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদানগুলি পরিমিতভাবে ব্যয় হওয়ার জন্য মাটির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইতে পারে না। পর্য্যায়ক্রমে কতক জমি পতিত রাখিয়াও মাটির ক্ষয় বন্ধ করা যাইতে পারে। ঐ পতিত জমির উপর সারা বৎসর ধরিয়া গরু মহিষ চরাইয়া উহাদের মলমূত্রের দ্বারা জমির উর্ব্বরতা ফিরাইয়া আনা যায়। ইহা ছাড়া মাটির ক্ষয় হইয়া উহার উর্ব্বরতা নষ্ট হইলে কৃত্রিম উপায়ে সার প্রয়োগ করিয়াও মাটির উর্ব্বরতা বাড়ান যায়।

প্রশ্ন

১। সার কাহাকে কহে? উহার আবশ্যকতা কি? নানাবিধ সারের বিষয় কি জান?

২। মাটির ক্ষয় বলিতে কি বুঝ?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্করিণী পর্য্যবেক্ষণ

জমি চাষ করিয়া ভাল ফসল পাইতে হইলে কৃষিক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মাটিতে উদ্ভিদের জন্য নানারূপ খাদ্যদ্রব্য থাকিলেই শুধু চলিবে না, গাছ যাহাতে ঐ খাদ্যদ্রব্য সহজে শোষণ করিয়া লইতে পারে সেজন্য উহাদিগকে উপযোগী করিতে হইবে। ইহার জন্য জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা প্রয়োজন। বৃষ্টির পর যখনই সুবিধা হয় তখনই লাঙ্গল কিংবা কোদাল দিয়া জমিকে খুঁড়িয়া দিতে হয়। মাটিকে যতই কর্ষণ করা যায়, ততই উহা রোদ হাওয়া পাইয়া থাকে। এইরূপ মাটিতে গাছের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার শক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মাটি কর্ষণ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সমস্ত মাটি ভাল করিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। স্থানে স্থানে ঢেলা পাকাইয়া বা চাকা চাকা হইয়া থাকিলে সেই জমিতে ফসল ভাল করিয়া জন্মাইবে না। মাটি কর্ষিত হইবার পর জমি তৈয়ার করিবার সময় ক্ষেতের কোথাও উঁচু বা কোথাও নীচু যেন না থাকে। অসমান জমিতে সমানভাবে বীজ পড়িতে পারে না, ফলে ক্ষেত্রের এক এক জায়গায় ভাল-মন্দ ফসল জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য লাঙ্গল বা কোদাল দিবার পর মই দিয়া জমিকে সমতল করিতে হয়।

মাটির কর্ষণ সকল সময়েই চলিতে পারে কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি সময়ই প্রশস্ত। ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে একবার লাঙ্গল দিলে আগাছা, পোকামাকড় প্রভৃতি নষ্ট হইয়া

যায়। ইহাতে গাছের রোগ হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এক পশলা বৃষ্টির পর অথবা বর্ষার শেষে জমি কর্ষণ করা উচিত। বর্ষাকালে জমি ভিজা থাকে, সেজন্য কর্ষণ ভাল হয় না এবং মাটিও চাপ বাঁধিয়া যায়। জমি অন্ততঃ তিন-চার বার কর্ষণ করা উচিত। বিভিন্নপ্রকার শস্যের জন্য কখনও গভীর কখনও বা অগভীর ভাবে কর্ষণ করিতে হয়। যে সব জমিতে পলি পড়ে সে সব জমিতে গভীর কর্ষণের প্রয়োজন হয় না। জমিতে বেশি জল যাহাতে দাঁড়াইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। জমি বড় হইলে একটি বড় নালা কাটিতে হয় ও উহার সহিত জমির চারিদিকে ছোট-ছোট নালা কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে বৃষ্টির জল ঐ স্থানে না দাঁড়াইয়া নালা দিয়া নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

জল ফসলের প্রাণস্বরূপ। এই জন্য জমিতে ভালভাবে জল-সেচনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে পুকুরের পর্য্যবেক্ষণ করিলে জলের অভাব কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইতে পারে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে যে সমস্ত বড় পুকুর থাকে তাহাতে নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্, যেমন, কচুরীপানা, বড়পানা, পদ্ম, শালুক, প্রভৃতি না জন্মিতে পারে সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পুকুর জলপূর্ণ থাকিলে বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। পুকুর হইতেই জল-সেচনের কার্য্য সহজেই সমাধা হইতে পারে। সেইজন্য প্রতি বৎসর পুকুরের জলজ উদ্ভিদ্‌গুলিকে নিয়মিত ভাবে তুলিয়া ফেলিলে জলের অভাব ঘটিতে পারে না। ইহা ব্যতীত যে সমস্ত শুষ্ক বা মজা পুকুর আছে সেগুলির সংস্কার করা উচিত। পাঁক বা মাটি তুলিয়া সেগুলি গভীর করিয়া দিলে উহার জল গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় না। সেই জলে সেচ চলিতে পারে। ঐ মাটিও জমিতে দিলে জমির

উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে। পুকুরে প্রতি বৎসর মাছের চারা ফেলিলে উহা হইতে আহারের চাহিদা কিছুটা মিটান সম্ভবপর হইতে পারে এবং অতিরিক্ত মাছ হইতে যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন হইবে। এই সমস্ত কারণে পুষ্করিণীর পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্কার খাদ্য-উৎপাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন

১। কৃষিক্ষেত্র তৈয়ার করা কাহাকে বলে? কৃষির সহিত জলের সম্পর্ক কি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

বায়ু

আমরা খালি চোখে বায়ুকে দেখিতে না পাইলেও পৃথিবী বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই বায়ু আছে বলিয়াই জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছে। বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবীর সহিত লাগিয়া আছে এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার গতি হয়।

বায়ু প্রবাহ—বায়ুর তাপ ও চাপের তারতম্যই বায়ুপ্রবাহের প্রধান কারণ। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুর চাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য বায়ু চলাচল করে। যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকের নাম অনুসারে বায়ুর নামকরণ হইয়া থাকে; যেমন, উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে উত্তর বায়ু বলে।

বায়ুর ধর্ম্ম—বায়ু উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে ও হাল্কা হয় এবং ঠাণ্ডা হইলে সঙ্কুচিত হইয়া ভারী হয়। বায়ুর উপর বেশি চাপ পড়িলে উহা সঙ্কুচিত, ভারী ও গরম হয় এবং চাপ কমিলে উহা আয়তনে বাড়ে এবং হাল্কা ও ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্পমিশ্রিত বায়ু শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা। গরম বায়ু অপেক্ষা ঠাণ্ডা বায়ু বেশি বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে।

মুক্ত বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা—বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তার কথা এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা খাদ্যাভাবে প্রায় দুই মাস বাঁচিতে পারি, জলের অভাবে দুই সপ্তাহ, কিন্তু বায়ুর অভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যাই। ঘরের মধ্যে অনবরত ধীর গতিতে ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও অক্সিজেন গ্যাস-যুক্ত বাতাস আসা আবশ্যক। ঘরের ভিতরকার বাষ্পভরা, গরম ও কম অক্সিজেনযুক্ত বাতাস যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অক্সিজেন-যুক্ত বাতাস না পাইলে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ ও দূষিত বায়ুর উপাদান—রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বায়ু কয়েকটি গ্যাসের সমষ্টিমাত্র। ইহা মিশ্রিত অবস্থায় আছে বলিয়া বায়ুকে মিশ্র পদার্থ বলা হয়। বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান হইল প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। ইহা ব্যতীত বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প অতি অল্প পরিমাণে থাকে। নানা কারণে বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। উহা হইতে অক্সিজেন গ্যাসের ভাগ কমিয়া যাইলে অথবা উহাতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। ইহা

ব্যতীত ধূলা বা ভুসার কণা অথবা নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু মিশ্রিত থাকিলে সেই বায়ু স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতি করে।

দূষিত বায়ুর বিশোধন প্রণালী—নানাবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু নিয়ত বিশোধিত হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর কোনও অস্তিত্ব থাকিত না। বায়ুতে যে সকল গ্যাস থাকে তাহাদের পরিমাণের তারতম্য ঘটিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল উপাদানের সমতা শীঘ্র বজায় করিবার জন্য তপ্ত ও হাল্‌কা বাতাস উপরে উঠিয়া যায় এবং ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারী বাতাস নামিয়া আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। বায়ুর ধূলাবালি ও রোগ-জীবাণু বৃষ্টির জলে ধুইয়া ভূমিতে পড়ে ও উহাকে বিশুদ্ধ করে। সূর্য্যকিরণের দ্বারাও বাতাসের রোগ-জীবাণু ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়েও বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখা যাইতে পারে। ধূলাবালি কমাইবার জন্য পাকা পথঘাট প্রস্তুত করাইলে ও উহাদের পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বায়ুর ধূলিকণা অনেক কমিয়া যায়। লোকবসতির বহুদূরে আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান, গোরস্থান ও কল-কারখানা তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং পচা ডোবা, পুকুর প্রভৃতি বুজাইয়া ফেলিলে বায়ু দূষিত হইবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কম থাকে। ঘরের ভিতরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে সেজন্য ঘরে বড় বড় জানালা ও উহার ছাদের নিকট ঘুলঘুলি বা 'ভেন্টিলেটার' রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখিতে বৃক্ষাদি উদ্ভিদের দান অতুলনীয়। সবুজ উদ্ভিদ্ দিনের বেলায় বাতাস হইতে দূষিত গ্যাস কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড নিজের দেহের মধ্যে টানিয়া লইয়া অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে উহা

হইতে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পকে বাহির করিয়া দেয়। আবার শ্বাসকার্য্যের সময় উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্যাস টানিয়া লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার জন্য বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়া যায় বলিয়া বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে; কিন্তু খাদ্য-প্রস্তুতির ফলে এই অতিরিক্ত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিদ্ টানিয়া লয় বলিয়া বায়ু দূষিত থাকিতে পারে না। সেইরূপ শ্বাসকার্য্যের সময় অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ বায়ু হইতে কমিয়া যায় কিন্তু খাদ্যপ্রস্তুতির সময়ে উদ্ভিদের দেহ হইতে যে অক্সিজেন গ্যাস বাহির হইয়া আসে তাহাই বায়ুতে উহার অভাব পূর্ণ করে। এইরূপে উদ্ভিদের দ্বারা বায়ুতে এই দুই গ্যাসের সমতা রক্ষা হইয়া থাকে।

জনবহুল ও আবদ্ধ গৃহের বাতাস—একটি ঘরে অনেক লোক একত্র বাস করিলে সেই ঘরের বাতাস দূষিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বাসকার্য্যের সময়ে অক্সিজেন টানিয়া লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। সেই কারণে ঘরে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা না থাকিলে সেখানকার বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের ভাগ কমিয়া যায় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বায়ুকে দূষিত করে। পরিচ্ছদ ও গাত্র হইতে নানাপ্রকার ময়লা ও দূষিত পদার্থ ঐ ঘরে সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং যদি কাহারও দেহে কোনও রোগ-জীবাণু থাকে তাহা বাতাসের সহিত মিশিয়া উহাকে দূষিত করে। যে ঘরের বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য খুব বেশি হয় সেই ঘরে বাস করিলে হাই উঠা, গা বমি বমি করা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ শরীরে দেখা

দেয়, এমন কি অজ্ঞান হইয়া পড়িবারও সম্ভাবনা থাকে। আবদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বাস করিলে শ্বাসকার্য্যের অসুবিধা হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল জনবহুল ঘরে বাস করিবার ফলে মানুষ দুর্ব্বল ও ফ্যাকাশে হইয়া যায়, বয়স্কদের ক্ষয়কাশ, বুকের পীড়া প্রভৃতি দেখা দেয় ও উহাদের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা লোপ পায় এবং শিশুদের অস্থিপীড়া (রিকেট) হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালী—প্রশ্বাসের সময়ে বায়ু নাকের ছিদ্র, গলনালী ও শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুসের গায়ে খুব সরু সরু জালশিরা থাকে। ঐ সকল জালশিরা দিয়া রক্ত চলাচল করিবার সময় উহা বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং উহা হইতে অক্সিজেন ভাগ টানিয়া লয়; ইহাতে রক্তের বিশোধন হইয়া থাকে। এই সময়ে রক্ত দেহের নানাস্থান হইতে আনীত দূষিত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত বায়ুতে ছাড়িয়া দেয় এবং উহা কিছু জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া আসে।

প্রশ্ন

১। বায়ুর উপাদান ও উহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি জান ?

২। দূষিত বায়ু কি কি উপায়ে বিশোধিত হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে লিখ।

ষোড়শ অধ্যায়

জল

জল—ভূপৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ স্থান জলের দ্বারা আবৃত। জলের কঠিন অবস্থাকে আমরা বরফ, তরল অবস্থাকে জল ও গ্যাসীয় অবস্থাকে জলীয় বাষ্প বলি।

জলের ধর্ম্ম—বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। ইহার নিজস্ব কোন বর্ণ নাই। জল সর্ব্বদা ঢালুর দিকে গড়াইয়া যায়। ইহার আয়তন আছে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। জলের ওজন আছে ও ইহা শব্দবহ। একশত ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড) তাপে ইহা ফুটিয়া বাষ্প হয় এবং শূন্য ডিগ্রি তাপে জমিয়া বরফে পরিণত হয়।

জলের প্রয়োজনীয়তা—জীবমাত্রেরই জলের একান্ত প্রয়োজন। জল না হইলে কোন জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় হইতেই সবীজ উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। চারাগাছ বা বড় গাছকে বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে মাটি হইতে রস লইতে হয়। মাটি হইতে এই রস মূল দিয়া গাছের শরীরে প্রবেশ করে। ঐ রসে বেশি পরিমাণে জল থাকে এবং উহা মূল ও কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় যায়। পাতার সবুজকণা ঐ রসের জল ও বাতাসের কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড হইতে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। কৃষিকার্য্যের জন্যও জলের যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে জলসেচনের জন্য এখন স্বাধীন ভারতে নানাবিধ বাঁধের পরিকল্পনা ও তাহার অনুরূপ কাজ হইতেছে। উদ্ভিদ্ ব্যতীত নানা-প্রকার পশুপক্ষীর প্রাণধারণের জন্যও জলের নিতান্ত প্রয়োজন।

স্নান ব্যতিরেকে জীবনধারণ অতি কষ্টদায়ক। আমাদের দেহে জলের প্রয়োজন অনেক বেশি; দেহের অধিকাংশ ভাগই জল। দেহের শতকরা পাঁচ ভাগ জল ঘাম ও প্রস্রাব রূপে বাহির হইয়া যায়। দেহের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে তাহাতেও জলের যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে। তৃষ্ণা নিবারণে, পরিপাক রস সৃষ্টি করিতে, শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির করিবার এবং দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। ইহা ব্যতীত স্নান, রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যে, জিনিসপত্র, বাড়ীঘর, রাস্তা, ময়লা প্রভৃতি ধৌত করিতে, অগ্নি নিবারণ করিতে, সকল কাজেই জলের যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ ও দূষিত জলের উপাদান—প্রাচীনকালে জলকে মৌলিক অর্থাৎ একটি পদার্থ বলিয়া মনে করা হইত। এখন ইহাকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই গ্যাসের রাসায়নিক মিলনের ফলে জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জলকে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট করিলে ইহা হইতে—দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জলই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জল মাটির ভিতর দিয়া যখন কোন ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে তখন প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। মাটির ভিতরকার নানাবিধ পদার্থ ঐ জলে দ্রবীভূত থাকে। উহাতে সাধারণতঃ কোন ময়লা থাকে না। সেইজন্য প্রাকৃতিক জলের মধ্যে প্রস্রবণের জলকে বৃষ্টির জলের পরেই স্থান দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ জলের উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ছাড়াও ইহাতে দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত অবস্থায় অনেক পদার্থ থাকিতে পারে, যেমন, নানাবিধ ময়লা, লবণ, দূষিত গ্যাস প্রভৃতি।

দূষিত জলের জন্য সংক্রামিত ব্যাধি—কতকগুলি রোগ আছে যাহার জীবাণু জলে সংক্রামিত হইলে সেই জল যদি অন্য লোকে পান করে তাহা হইলে জলের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলে, যেমন কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি। এই সকল রোগীর মলমূত্র বা তাহাদের দূষিত কাপড়, বিছানা প্রভৃতি কাচিলে জলদূষিত হয়। অনেক সময়ে কৃমিরোগগ্রস্ত রোগীর মল জলে পড়িলে উহা হইতে কৃমির ডিম আসিয়া জলকে দূষিত করে। সেই জল পান করিলে অন্য লোকেরও কৃমিরোগ হইতে পারে। অপরিষ্কার জল পান করিলে আরও নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। অনেকদিন ধরিয়া যদি খনিজ পদার্থবহুল জল পান করা যায় তাহা হইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ক্ষুধা না হওয়া, ডিসপেপ্‌সিয়া, পাথরী প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

গ্রামের কুপ, পুকুর ও নদীর জল—পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ কূপ, পুকুর ও নদী হইতে লোকে পান ও রন্ধনাদির জন্য জল সংগ্রহ করে। অনেকস্থলে খাল ও ঝরণার জলও ব্যবহার করা হয়। কূপ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা,—(১) কাঁচা কূপ, (২) পাকা কূপ, ও (৩) নলকূপ।

যে কূপ অতি অল্প গভীর ও মাটি দিয়া বাঁধান থাকে তাহাকে কাঁচা কূপ কহে (৩৭নং চিত্র)। যে কূপ অপেক্ষাকৃত গভীর ও নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত ইট দিয়া গাঁথা এবং চুনবালি বা বালিসিমেণ্ট দিয়া পলস্তারা করা তাহাকে পাকা কূপ বলে (৩৭নং চিত্র)। যে কূপ মাটির খুব নীচে নল বসাইয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকে নলকূপ বলে (৩৮নং চিত্র)।

কাঁচা কুপের জল—কূপের ধারে লোকে স্নান করে, বস্ত্রাদি ধোয়, এমন কি রোগীর মলমূত্রসংযুক্ত বস্ত্রাদি কাচিয়া থাকে, বাসন

মাজে, এবং গরু মহিষ প্রভৃতি স্নান করায়। এই সকল কারণে কূপের চারিপাশের মাটি সর্ব্বদা ময়লা ও দূষিত জলে সিক্ত থাকে। ইহা ছাড়া কূপের নিকট পায়খানা, গোয়ালঘর, আস্তাবল প্রভৃতি থাকিলে ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত জল মাটির ভিতর দিয়া চুয়াইয়া কূপের মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহার জলকে দূষিত করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া কূপের জল তুলিবার সময় অনেকে অপরিষ্কার পাত্র ও দড়ি ব্যবহার করিয়াও কূপের জল দূষিত করে।
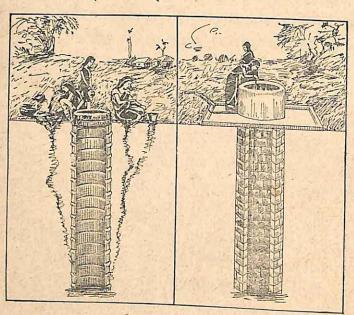
৩৭। কাঁচা কূপ ও পাকা কূপ

পাকা কূপের জল—পাকা কূপের জল অনেকটা বিশুদ্ধ; কারণ কূপের ভিতরের দিক বাঁধান থাকে। ইহাতে অপরিষ্কার জল চুয়াইয়া উহার ভিতরের জলকে খারাপ করিতে পারে না। যদি কূপের

পাড়ের ধার বা গোড়া ভাল করিয়া 'সিমেণ্ট' দিয়া বাঁধান হয় তবে জল চুয়াইবার ভয় থাকে না। কূপ মাত্রেরই মুখ খোলা থাকে। কাছে গাছ থাকিলে তাহা হইতে শুখনা পাতা জলে পড়িয়া জলকে খারাপ করিতে পারে। তাহা ছাড়া ধূলাবালিও কূপের মধ্যে পড়িতে পারে। কূপের মুখে চাপা দিলে উহা নিবারিত হয় বটে কিন্তু রৌদ্র না পাওয়ায় উহার জল খারাপ হইয়া যায়।

৩৮। নলকূপ

নলকূপ — নলকূপের নল সাধারণতঃ গভীর হইয়া থাকে। অনেক নীচের জলের উৎস হইতে জল আসাতে উপরের দূষিত জল চুয়াইয়া ঐ জলে মিশিতে পারে না। নল ধাতুর দ্বারা তৈয়ারী ; সেইজন্য উপরের স্তরের দূষিত জল নলের সংস্পর্শে আসিলেও নলের ভিতরকার বিশুদ্ধ জলকে দূষিত করিতে পারে না। নলকূপের নলের মুখে সাধারণতঃ হাত 'পাম্প' লাগান থাকে ; উহার সাহায্যে জল উপরে উঠে। হাত-পাম্পের পরিবর্তে শহরে ইলেকট্রিক-পাম্পও লাগান হয় ; গ্রামে কিন্তু ইলেকট্রিক অভাবে তাহা সম্ভব নয়। মাটির তলায় নলকূপের যে মুখ দিয়া জল উপরে উঠে সেখানে ছাঁকন জালতি লাগান থাকে ; তাহাতে ছাঁকা হইয়া জল উপরে উঠে।
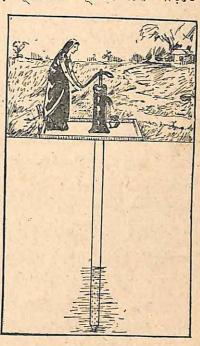
গ্রামের কূপ, পুষ্করিণী বা নদীর জল বিশোধনের প্রণালী—ঘোলা জলকে পরিষ্কার করিতে হইলে একটা ফটকিরির ডেলা জলের মধ্যে ডুবাইয়া নাড়াচাড়া করিলে জলের কাদা নীচে থিতাইয়া পড়ে।

৩৯। ফিল্টার

যেখানে কলের জল নাই, সেখানে বাড়ীতে ফিল্টারে ছাঁকিয়া জল খাওয়া উচিত। ছবিতে (৩৯নং চিত্র) যেরূপ দেখান হইয়াছে সেইরূপে একটি কাঠের মঞ্চের উপর পর পর চারিটি কলসী বসান থাকে। প্রথম তিনটি কলসীর তলায় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্যে পাট বা সূতা দেওয়া হয়। প্রথম কলসীতে অপরিষ্কার জল ঢালিলে উহা দ্বিতীয় কলসীতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে। দ্বিতীয় কলসীতে কাঠ-কয়লা থাকে। কাঠ-কয়লার উপর জল পড়িলে উহা কাঠ-কয়লার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া কলসীর ছিদ্র দিয়া নীচে তৃতীয় কলসীতে পড়ে। এই কলসীতে বালি থাকে। জল ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে যেমন উহার ময়লা ঐ কাগজের উপর আটকাইয়া থাকে, সেইরূপ বালির ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া গেলে উহাতেও জলের ময়লা আটকাইয়া যায়। বালি হইতে বাহির হইয়া পরিষ্কার জল চতুর্থ কলসীতে ধরা পড়ে। মাঝে মাঝে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া বালি ও কাঠ-কয়লা বদলাইলে ভাল হয়।
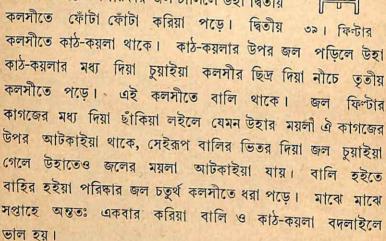
কূপের বা পুকুরের জল দূষিত হইলে পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ গুলিয়া কূপ বা পুকুরে দেওয়া উচিত, ইহাতে জলের জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

নরম ও কঠিন জল—জলে যদি ম্যাগনিসিয়াম বা ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণ থাকে তবে সেই জলে সাবানের ফেনা হইতে চায় না। ইহাকে কঠিন জল কহে। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় তাহাকে নরম জল বলে। কোন কোন কঠিন জলকে ফুটাইলে নরম হয়। যদি ম্যাগনিসিয়াম বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ থাকে তাহা হইলে জলকে সহজে নরম করা যায় না।

প্রশ্ন

১। জলের ধর্ম্ম কি? বিশুদ্ধ ও দূষিত জলের উপাদানের বিষয় সংক্ষেপে লিখ। কিরূপে জল দূষিত হইয়া থাকে?

২। নানাপ্রকার কূপের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। নরম ও কঠিন জল কাহাকে বলে?

সপ্তদশ অধ্যায়

কয়েকটি ব্যাধির সাধারণ আলোচনা

১। ***ম্যালেরিয়া***—ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ হইল দূষিত বাতাস, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে দূষিত বাতাস ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ নহে; ইহার কারণ হইল একপ্রকার জীবাণু। এই জীবাণু ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে থাকে। এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা যখন রোগীকে সূচ ফুটাইয়া নলের দ্বারা রক্ত শুষিয়া লয় তখন ঐ রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তাহার পেটে প্রবেশ করে। সেখানে জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে ও তাহারা মশার লালা বাহির হওয়ার গ্রন্থিতে বাস করে। পরে ঐ মশা যখন কোন সুস্থ লোকের দেহ হইতে রক্ত

খায় তখন ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। জীবাণু রক্তে আসিয়াই সংখ্যায় বাড়িতে থাকে ও রক্তের লাল কণিকাগুলিকে খাইয়া ফেলে। প্রত্যেক ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা অন্তর তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় ও সেই সময়ে রোগীর কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসে।

ম্যালেরিয়া কমাইতে হইলে বাসস্থানের চারিপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে ; তাহার কারণ মশা অন্ধকার স্থানে থাকিতে ভালবাসে। বদ্ধ জলে কেরোসিন তৈল ছড়াইলে উহা জলের উপর একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণ ভেদ করিয়া মশা জলের মধ্যে ডিম পাড়িতে পারে না অথবা মশার শূক শ্বাসকার্য্যের জন্য জলের বাহির হইতে বায়ু লইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। ম্যালেরিয়া রোগীকে কুইনাইন খাওয়াইয়া এই রোগের জীবাণুকে মারিতে হইবে ; তাহা হইলে এনোফিলিস নূতন করিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাইবে না। রাত্রে মশারি ফেলিয়া শুইলেও এনোফিলিস মশার আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা যায়। মোটামুটি দুইটি উপায়ে ম্যালেরিয়া কমাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করা অথবা স্ত্রী-এনোফিলিস মশা না থাকা, এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া থাকিবে না।

২। ***কলেরা***—'কোমা' নামক একপ্রকার জীবাণু খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মানুষের পেটে প্রবেশ করিলে এই রোগ তিন-চার দিনের মধ্যে দেখা দেয়। অনেক জীবাণু প্রবেশ করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে। রোগীর বমি ও পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে উহাতে কলেরার অসংখ্য

জীবাণু থাকে। রোগীর বমি বা মল লাগান কাপড়-জামা পুকুরে কাচিবার পর সেই পুকুরে বাসন মাজিলে অথবা সেখান হইতে পান করিবার জল লইলে এই রোগের বিস্তৃতি ঘটে। রোগীর বমি বা মলের উপর মাছি বসিয়া সেই মাছি আবার কোন খাবারে বসিলে কলেরার জীবাণু বিস্তার লাভ করে।

জল ফুটাইয়া পান করা, খাবার জিনিস চাপা দিয়া রাখা, রোগীর ভেদ বমি কোন পাত্রে রাখা এবং তাহা বিশুদ্ধীকরণ ঔষধের দ্বারা শুদ্ধি করা, শুশ্রূষাকারিগণের হাত পা ভাল করিয়া ধুইয়া তবে খাবার বা পানীয় জিনিস গ্রহণ করা প্রভৃতি কলেরা রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা। কলেরার টিকা সকলের লওয়া উচিত। এই রোগে রোগীর রক্তের জলীয় অংশ ভেদ ও বমি রূপে বাহির হইয়া যায় বলিয়া বাহির হইতে যদি লবণ মিশ্রিত জল উহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে উহা রোগীকে সুস্থ হইতে সাহায্য করে। কোন রোগ হইলেই প্রকৃতি তাহার উপশমের জন্য শরীরের মধ্যে এমন একপ্রকার জিনিস তৈয়ার করে যাহার দ্বারা জীবাণু মারিতে সাহায্য হয়। লবণ জল রোগীর দেহের শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে প্রকৃতিকে সাহায্য করা হয়।

৩। ***টাইফয়েড*** বা ***আন্ত্রিক জ্বর***—আহার্য্য ও পানীয় হইতে এই রোগ আসে। এই রোগে রোগীর পৌষ্টিকনালীতে ঘা হয়। রোগীর মলমূত্রযুক্ত কাপড় পুকুরে কাচিলে ও সেই পুকুরের জল পান করিলে এই রোগের বিস্তার হয়। টাইফয়েডের টিকা আছে; তাহা লইলে এক বৎসর এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। রোগীর মলমূত্রের উপর বিশুদ্ধীকরণ ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ; ইহাতে মলমূত্র ফেলিবার পূর্ব্বে উহা জীবাণুশূন্য হইয়া যাইবে। রোগীর

চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 'ক্লোরোমাইসিটিন' নামক ঔষধ এই রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

৪। **বসন্ত**—বসন্ত রোগীর দেহে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। উহা হইতে ঘা হয়। গুটি শুকাইলে উহা হইতে বসন্তের জীবাণু বাতাসের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। রোগীকে পৃথকভাবে রাখা উচিত। শুশ্রূষাকারীরা সর্ব্বদা সাবধানে হাত-পা ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া তবে অন্য ঘরে আসিবেন। বসন্তের টিকা লওয়া সকলেরই প্রয়োজন এবং প্রতি বৎসর টিকা লওয়া উচিত।

৫। **যক্ষ্মা**—দুর্ব্বল দেহে এই জীবাণু বেশি দেখা দেয়। রোগীর থুতু ও কফ হইতে এই রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে। সেইজন্য থুতু ও কফ যেখানে-সেখানে ফেলা এবং রোগীর উচ্ছিষ্ট খাওয়া উচিত নয়। রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা রাখিতে হয়। প্রচুর আলো, হাওয়া ও রৌদ্রযুক্ত ঘর রোগীর বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে এবং খোলা জায়গায় বাস করিলে রোগের উপশম হইতে পারে। তাহা ছাড়া আজকাল অনেক রকম নতুন ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে যাহা দ্বারা রোগের উপশম হয়। যক্ষ্মার রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী 'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন' নামক ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ওয়াকস্‌ম্যান নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

প্রশ্ন

১। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কি? কি উপায়ে ঐ রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে?

২। বসন্ত ও আন্ত্রিক জ্বর কাহাকে বলে? যক্ষ্মারোগের কারণ কি?

অষ্টাদশ অধ্যায়

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা

আকস্মিক দুর্ঘটনা মানব-জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিলে আহত ব্যক্তির যথেষ্ট উপকার এমন কি প্রাণরক্ষা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। দুর্ঘটনায় পড়িলে উহার সদ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয় নচেৎ বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা সহায়তা করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যায় এবং রোগীও সুস্থ বোধ করে। ইহার জন্য গৃহে সকল সময়ে কিছু পরিষ্কার কাপড়, ব্যাণ্ডেজ, একটি কার্ব্বলিক সাবান, সূতা, কাঁচি, সেফ্‌টিপিন অল্প টিংচার আয়োডিন ও বেনজিন, বোরিক এসিড প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। দুর্ঘটনা ঘটিলে কি প্রাথমিক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য তাহার কয়েকটির কথা নীচে উল্লেখ করা হইল।

১। ***আগুনে পোড়া***—কাপড়ে আগুন লাগিলে আদৌ ছুটা-ছুটি করিতে নাই। সম্ভব হইলে লজ্জা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড়-জামা খুলিয়া ফেলিতে হয়। যদি তাহার সময় না থাকে তাহা হইলে কোনও কিছু ভারী জিনিস যেমন, লেপ, চট, কম্বল, মোটা কাপড় প্রভৃতি দিয়া কাপড়ের আগুনকে চাপা দিলে উহা বাতাসের অভাবে নিভিয়া যায়। আগুনে পোড়া অংশে জল বা বাতাস লাগা বিপজ্জনক। সামান্য পুড়িলে ঐস্থানে স্পিরিট, গরম ঘি বা নারিকেল তৈলের পটি দিলে রোগীর যন্ত্রণার কিছু উপশম হইয়া থাকে। দগ্ধ-স্থান বেশি হইলে অল্প গরম জলে এক চামচ খাইবার সোডা ও

কিছু বোরিক এ্যাসিড মিশাইয়া উহাতে দগ্ধস্থান ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐস্থানে যদি ফোস্কা পড়ে তাহা কখনও গালিয়া দিতে নাই। প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রয়োজন হইলে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

২। ***জলে ডোবা***—জলে ডুবিলে রোগী শ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা যায়। যতশীঘ্র সম্ভব জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উঠাইয়া ও উহার গলায় আঙ্গুল দিয়া মুখের ভিতরটা পরিষ্কার করিয়া দিতে

৪০। কৃত্রিমশ্বাসের প্রক্রিয়া

হইবে। তারপর উহার মাথা নীচু করিয়া পা দুইটিকে উপরের দিকে উঠাইয়া দেহটিকে ঝুলাইয়া রাখিলে ভিতরকার জল কিছুটা বাহির হইয়া আসিবে। কাপড়ের বাঁধন যদি কিছু থাকে তাহা খুলিয়া অথবা কাটিয়া দিয়া এই অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে জলমগ্ন ব্যক্তিকে অনেক সময়ে বাঁচান যায়। যে সকল উপায়ে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহাদের মধ্যে **শেফারের প্রণালী** অন্যতম। ইহাতে রোগীকে মাটিতে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হয় ও উহার বুকের নীচে একটি পাতলা বালিশ বা জামা জড়াইয়া রাখিয়া মাথাটিকে এমনভাবে রাখিতে হয় যাহাতে উহা একটু নীচু

হইয়া পাশের দিকে বাঁকিয়া থাকে। এইবার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য চালনা করা উচিত। ইহার জন্য আরও একজনের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। প্রথমে একজনকে একপাশ হইয়া অথবা রোগীর উভয় পাশে পা রাখিয়া উহার মাথার দিকে মুখ করিয়া বসিতে হইবে। তারপর হাঁটু গাড়িয়া রোগীর শেষ পাঁজরার নীচের দিকে দুই হাত দিয়া একসঙ্গে জোরে চাপ দিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। হাত বুকের দিকে পাঁজরার শেষপ্রান্তে আসিলে প্রত্যেকবার হাত উঠাইয়া আবার শেষ পাঁজরার উপর আগেকার মত চাপ দিয়া নীচের দিকে হাতকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। প্রতি মিনিটে অন্ততঃ দশবার করিয়া এইভাবে আধঘণ্টা চালাইতে পারিলে রোগীর মুখ দিয়া বায়ু ও জল বাহির হইয়া আসিবে এবং পুনরায় শ্বাসকার্য্য ও হৃদয়ের স্পন্দন আরম্ভ হইবে। এই কাজ করিবার সময় একজন ক্লান্ত হইয়া পড়ে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

৩। ***কুকুরে কামড়ান***—পাগলা কুকুরের দংশন অত্যন্ত মারাত্মক। উহার লালাতে একপ্রকার জীবাণু থাকে; তাহার দ্বারা কুকুরে কামড়ান ব্যক্তির রক্ত দূষিত হইয়া **জলাতঙ্ক রোগ** দেখা দেয়। রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে সাধারণতঃ চার হইতে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে। কোন কোন সময়ে তাহার আগেও লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। উহাদের মধ্যে প্রধান লক্ষণ হইল জল দেখিলে ভয় পাওয়া। জলের পাত্র কাছে আনিলেই রোগী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুরের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং পিছনের পা দুইটি পড়িয়া যায়। এই রোগ দেখা দিবার আট দশ দিনের মধ্যেই কুকুরটি মারা পড়ে। কুকুরে কামড়াইলে ঐ কুকুরের দেহে ঐ সকল

লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না সেবিষয়ে অন্ততঃ দশদিন উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া লক্ষ্য করা উচিত। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে, কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ধুইয়া উহাতে টিংচার আয়োডিন, এবং কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি লাগাইতে হইবে। তারপর ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু প্রতিষেধক ঔষধ বাহির করিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ঐ ঔষধের ইন্‌জেক্‌সন দুই সপ্তাহ ধরিয়া লইলে কুকুরে দষ্ট ব্যক্তির শরীরে এমন একটি জিনিসের সৃষ্টি হয় যাহাতে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মারা পড়ে। ভারতের নানা স্থানে এখন এইপ্রকার অনেক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে 'পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট' অন্যতম।

৪। ***সর্পাঘাত***—সাপ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—বিষহীন ও বিষধর। বিষধর সাপের উপরের চোয়ালের মধ্যে দাঁতের
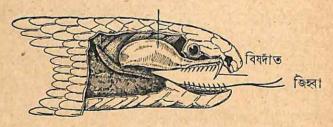
৪১। দেশীয় বিষাক্ত সাপের বিষের থলি ও বিষদাঁত দেখান হইয়াছে

সারির উপর বিষের থলি থাকে। থলির মুখটি সরু হইয়া বিষদাঁতের সহিত যুক্ত থাকে। সাপে কামড়াইলে ঐ থলি হইতে তরল বিষ

দাঁতের গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়া আসে ও শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। বিষধর সাপে কামড়াইলে উহার দুইটি দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়; বেশি দাগ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে বিষহীন সাপে কামড়াইয়াছে। সাপে কামড়াইলে ভয়ে অধীর হইতে নাই। ক্ষতস্থানের কিছু উপরে দড়ি অথবা কাপড় দিয়া দুই তিনটি শক্ত বাঁধন দিতে হইবে, ইহাতে রক্ত চলাচল করিতে পারিবে না ও বিষ শরীরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে না। ক্ষতস্থানের চারিপাশ অল্প গভীর করিয়া কাটিয়া দিলে রক্তের সহিত সাপের বিষের খানিকটা বাহির হইয়া আসিবে এবং বিলম্ব না করিয়া সত্বর ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রশ্ন

১। আগুনে পুড়িলে অথবা জলে ডুবিলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে কি করিতে হইবে?

২। শেফার-প্রণালীর দ্বারা কিরূপে কৃত্রিম শ্বাসকার্য্য চালনা হইয়া থাকে তাহার বিবরণ দাও।

৩। জলাতঙ্ক রোগ কাহাকে বলে? ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি?

৪। সাপে কামড়াইলে কি করিতে হইবে?

ঊনবিংশ অধ্যায়

চুম্বক ও বিদ্যুৎ এবং উহাদের ব্যবহার

চুম্বক—এশিয়া মাইনর, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশের খনিতে একপ্রকার ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের পাথর পাওয়া যায়। এই পাথরে লোহার ভাগ বেশি থাকে। ছোট ছোট লোহার টুকরা ইহার দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই শক্তিসম্পন্ন স্বভাবজাত পাথরকে **চুম্বক-**

পাথর বলা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের লোকরা ইহার অদ্ভুত গুণাবলী প্রথম লক্ষ্য করেন। এই পাথরের একটি টুকরা সূতার দ্বারা ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে উহার একটি প্রান্ত সকল সময়ে উত্তরদিকে থাকে। চুম্বকপাথরের এই প্রান্তটিকে **উত্তরমেরু** এবং অপর প্রান্তটিকে **দক্ষিণমেরু** বলা হয়। ছোট ছোট লোহার টুকরা কাছে আনিলে চুম্বকপাথরের দুই প্রান্তে উহারা আটকাইয়া যায় (৪২নং চিত্র)। একটি চুম্বকপাথরের উত্তরমেরুকে অপর একটি চুম্বকপাথরের দক্ষিণমেরুর নিকটে ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে উহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয় কিন্তু উহাদের উভয়ের উত্তর বা দক্ষিণমেরু পরস্পরের দিকে রাখিলে উহারা আকৃষ্ট না হইয়া বিপরীত ব্যবহার করে অর্থাৎ দূরে সরিয়া যায়। দুইটি চুম্বকের পরস্পর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবার ক্ষমতাকে **চৌম্বকশক্তি** বলে। লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে এবং উহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যাইতে পারে। কাঠ, কাগজ, কাচ, দস্তা, তামা, পিতল প্রভৃতি পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না অথবা উহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। একটি সাধারণ লোহার টুকরাকে চুম্বকের যে কোন একটি মেরু দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কয়েকবার ঘষিলে ঐ লোহা চুম্বকে পরিণত হইয়া থাকে। কাঁচা লোহা অপেক্ষা ইস্পাতেই চৌম্বকশক্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়।

৪২। চুম্বক ছোট ছোট লোহার টুকরা আকর্ষণ করিয়াছে

ইহা ছাড়া সোজা বা ঘোড়ার ক্ষুরের মত একটি কাঁচা লোহার টুকরাকে রেশমে ঢাকা তামার তার জড়াইয়া উহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিলে লোহাটি চুম্বকে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাকে **বিদ্যুৎ-চুম্বক** বলে। তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইলে উহার চৌম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ইস্পাতের দ্বারা এইরূপ চুম্বক প্রস্তুত করিলে উহার শক্তি স্থায়ী হয়। চৌম্বক-শক্তি কৃত্রিম উপায়ে নষ্ট করা যাইতে পারে। একখণ্ড চুম্বক আগুনে পোড়াইলে বা কয়েকবার জোড়ে আছড়াইলে উহার চৌম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

বিদ্যুৎ—তাপ, আলো, শব্দ প্রভৃতির মত বিদ্যুৎও একপ্রকার শক্তি। ইহা সহজেই তাপ, শব্দ ও আলোতে পরিণত হইতে পারে। ইহার পরিচয় আমরা নানা-ভাবে পাইয়া থাকি। উপরের স্তরের মেঘের মধ্যে অথবা ভারী জলকণা যখন বৃষ্টির আকারে বেগে নীচের দিকে পড়িতে থাকে তখন উহাদের মধ্যে বিপরীত শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই দুই বিপরীত শক্তির বিদ্যুৎ নিকটে আসিলে পরস্পর আকৃষ্ট হয় এবং উহারা যুক্ত হইয়া যে তীব্র আলোকের সৃষ্টি করে তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ বলিয়া থাকি। এই সময়ে যে শব্দশক্তির উদ্ভব হয় তাহাকেই মেঘগর্জ্জন বলে।
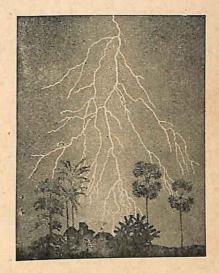
৪৩। বিদ্যুৎ

গাছ, বাড়ী প্রভৃতির উপর পড়িয়া বিদ্যুৎ যখন উহাদের জ্বালাইয়া দেয় তখন উহার তাপ ও দাহিকা-শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

বিদ্যুৎ যখন কোনও তারের ভিতর দিয়া বহিয়া যায় তখন তাহাকে **বিদ্যুৎ-প্রবাহ** বলা হয়। বিদ্যুৎ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা,—**স্থির বা ঘর্ষ-বিদ্যুৎ** এবং **চল-বিদ্যুৎ**। বিশেষ বিশেষ জিনিসের ঘর্ষণে ঘর্ষ-বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একটি গালার কাঠিকে পশমের কাপড় দিয়া ঘসিলে ঘর্ষ-বিদ্যুতের উৎপত্তি হইবে। ইহার স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় না বটে কিন্তু উহা অক্লেশে ছোট ছোট কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতে পারে। বিদ্যুৎ যখন কোনও পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন তাহাকে চল-বিদ্যুৎ বলে। একটি রূপার টাকা ও একটি তামার পয়সা লইয়া প্রথমটিকে জিহ্বার উপরে এবং দ্বিতীয়টিকে নীচে রাখিয়া উহাদের পরস্পরকে ছোঁয়াইলে জিহ্বাটি চিন্ চিন্ করিতে থাকিবে। এইরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এইরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে।

চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যবহার—চুম্বক ও বিদ্যুৎকে মানুষ নানাভাবে কাজে লাগাইয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে চুম্বকের দ্বারা দিগ্‌দর্শী যন্ত্র বা কম্পাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা নাবিকেরা সমুদ্রপথে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে। এই কম্পাসের সাহায্যেই কলম্বাস ঠিক পথে চলিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের প্রকৃতি অবগত হইয়া বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহাকে নানাভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। মানব-সভ্যতার উন্নতির জন্য বিজ্ঞান যাহা কিছু করিয়াছে তাহার অধিকাংশই বিদ্যুতের সাহায্যে হইয়াছে। আজকাল বড় বড় শহরে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রামগাড়ি ও

ট্রেন চলিতেছে। বিজলীবাতির সাহায্যে রাস্তা, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে এবং কলকারখানা চলিতেছে। বিদ্যুতের দ্বারা অদৃশ্য আলোক 'রঞ্জন' রশ্মি'র সৃষ্টি করিয়া দেহের ভিতরকার হাড়ের ছবি তোলা হইতেছে। দারুণ গ্রীষ্মে আর কষ্ট পাইতে হয় না; বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সাহায্যে মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া পাখা চলিতেছে। দেশ হইতে দেশান্তরে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে খবরের আদান প্রদান হইতেছে। টেলিফোন, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্ত্তা প্রভৃতি বিজ্ঞানের দান চুম্বক ও বিদ্যুতের সাহায্যেই সম্ভবপর হইয়াছে। ইহাদের যে আরও কত রকমের ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া শেষ করা যায় না।

প্রশ্ন

চুম্বক ও বিদ্যুৎ কাহাকে বলে? উহাদের ব্যবহারের বিষয় সংক্ষেপে লিখ।

বিংশ অধ্যায়

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমিতি, কৃষক-সমিতি, কৃষি-প্রচারপত্র দ্বারা সম্মিলিত প্রচেষ্টা

বিজ্ঞান পাঠ করিয়া অনেক কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আলাপ-আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমিতি, কৃষক-সমিতি ও কৃষি-সংক্রান্ত প্রচারপত্র সম্পাদন করিয়া এ বিষয়ে সফলতা লাভ করা যায়।

শহরের অথবা গ্রামের পল্লীতে একটি করিয়া 'বিজ্ঞান-সমিতি' বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিলে অতি শীঘ্রই প্রত্যেকের জ্ঞান বাড়িয়া যাইবে এবং নূতন নূতন তথ্য জানিবার উৎসাহ দেখা দিবে। ইহার জন্য সমিতির একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর থাকিলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের কাছ হইতে উপদেশ ও নূতন নূতন কথা জানিয়া লইতে হইবে। সেখানে নানাপ্রকার বিজ্ঞানের বই, সংবাদপত্র, পাতা ফুল ও ফল সমেত বিভিন্ন গাছের ছোট ছোট টুকরা, ধান, গম যব প্রভৃতি শস্যের নমুনা, কীট-পতঙ্গ, নানারকমের খনিজ পদার্থ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইভাবে কিছুদিনে একটি ছোটখাটো প্রদর্শনী বা যাদুঘর গড়িয়া উঠিবে। সংবাদপত্র হইতে নানা দেশের বৈজ্ঞানিক খবরের টুকরা সংগ্রহ করিয়া একটি খাতায় আঠা দিয়া লাগাইয়া রাখিলে তথ্যগুলি সকলেরই সময়মত কাজে লাগিবে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কৃষক-সমিতির প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও কৃষক-সমিতির সভ্যদের যুক্ত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানকে ঠিক ভাবে কৃষির উন্নতির জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে। এইরূপ করিলে বিজ্ঞান ও কৃষক-সমিতি অচিরে গ্রামের বা পল্লীর একটি অমূল্য সম্পদ হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইহাতে দেশের যথেষ্ট উপকারও হইবে।

প্রশ্ন

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমিতি, কৃষক-সমিতি ও কৃষি-প্রচারপত্রের দ্বারা সম্মিলিত প্রচেষ্টার সার্থকতা কোথায় ?

ENGRAVED AND PRINTED BY
REPRODUCTION SYNDICATE. CAL.